সবুজ মঞ্চ

সবুজ নক্ষত্র

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

বিশ্ববাণী প্রকাশনী ॥ কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ :
এপ্রিল ১৩৭১

প্রকাশক :
ব্রজকিশোর মণ্ডল
বিশ্ববাণী প্রকাশনী
৭৯/১ বি, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৯

মুদ্রক :
শ্রীগোপাল ঘোষ
শ্রীকৃষ্ণ প্রেস
৬, শিবু বিশ্বাস লেন
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ শিল্পী :
খালেদ চৌধুরী

পূজনীয় মাষ্টারমশাই

শ্রীফণিভূষণ সিংহ

পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু

সবুজ নক্ষত্র

বিদ্যাসাগর কে ছিল রে ?

পণ্ডিত।

হুঁ পণ্ডিত। লাল ফুল লিখেছিল। পড়েছিলুম। বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ।

চিনু শুনলি ? শালা পড়েছিল···বিদ্যাসাগর···হি হি হি···

সমু ভুরু কুঁচকে তাকিয়েছিল ইন্দার দিকে। ইন্দার হাসিটা কিছু বাতাস টেনে থেমে যেতেই আচমকা সে ওর দিকে ভোজালিটা ছুঁড়ে মারল। ভারি ভোজালি ইন্দার পায়ের দু'ইঞ্চি তফাতে গিয়ে মাটি ফুঁড়ল। ইন্দা লাফিয়ে উঠে সরে গেল।

চিনু আঁতকে উঠে বলল, যাঃ! কোন সেন্স নেই তোর।

সমু আর কথা বলল না। তার বসার ভঙ্গীতে আরাম ও ভালো ভাবনার পরিচয় আছে। পাদুটো লম্বা ছড়িয়ে একটা হাত ভর করে সে বসেছে। ভোজালিটা ছোঁড়বার পর ডানহাতে একটা ঘাসের কুটো তুলে দাঁতে চিবোচ্ছে। ঠোঁটের কোণায় কীরকম একটা চুপচাপ হাসি।

জেমস—হিকি জেমস একটু দূরে তরুণ শিশুগাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বসেছে। সে অভ্যাস মতো শুধু মিটিমিটি হাসছিল ওদের কাণ্ড দেখে। টেট্টি ওরফে পরসাদ বয়সে সবার বড়। হিকির পাশে চিত হয়ে শুয়ে সে চোখ বুজে আছে। কাঁচাপাকা গোঁফের ওপর তার লম্বা মোটা আঙুলগুলো খেলা করছে। সে একটা কিছু আন্দাজ করে শুধু বলল, কুত্তা কাঁহিকা!

ইনদা ভোজালিটা তুলে নাচাতে নাচাতে বলল, লাল ফুল দেখবি

সমু কান করল না।···চিনু, আমিও হয়তো বাবার সঙ্গে গা থেকে এসেছিলুম। বুঝলি ? ওই বিদ্যাসাগরের মতো। ভাবা যায় না!

চিনু মুখ তুলে কী খুঁজছিল। এবার নড়ে উঠল।···মাই গুডনেস! সমুর চোখ আছে রে। ছাখ ছাখ!

সাতজোড়া চোখ বনের ছায়া থেকে মাথার ওপর ঘুরে গেল। চঞ্চল সাতজোড়া মানুষের চোখ। ইনদা বলল, কত ফুল! লা-ল ফুল।

ফারু—ফারুক বন্দুকটা তাক করে বলল, পেড়ে দেব ?

টেট্টি চোখ খুলেছে সঙ্গে সঙ্গে। ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে বলল, দিল্‌লাগি মৎ করনা। তেরা শশুরাল নেহী বেটা!

চিনু বলল, টেট্টিদা, বসন্‌ত্‌বাহার! জোর জমে যাবে মাইরি।

ইনদা চঞ্চল হয়ে বলল, না না। রবীন্দ্রসংগীত।···ওরে ভাই, আগুন লেগেছে বনেবনে···

সমু হঠাৎ ডাকল, পান্নাদা!

প্রকাণ্ড শিমুলগাছের গুঁড়ি—তার ওপাশ থেকে অদৃশ্য কার গম্ভীর আওয়াজ শোনা গেল।···মাল খালি করেছিস ?

জবাবটা দিল ইনদা।···আর কয়েক ঢোক আছে। আপনার জন্যে গুরু!

সমু উঠে দাঁড়িয়ে বলল, মিস্টার কিন্তু এখনও এল না পান্নাদা। পাঁচটা বেজে গেল।

অদৃশ্য থেকে আওয়াজ এল—ছেড়ে দে। আর একটা ঘণ্টা আমরা দেখব।···

এই সাজানো গোছানো চমৎকার বনটাতে আরও একটা ঘণ্টা মানে রোদ যত নিভে আসে, চৈত্রের অশান্ত হাওয়া পড়ে ঝিমিয়ে —পাখিরা আরও ডাকতে থাকে—লাল ফুল কালো হয়ে যায় আস্তে আস্তে এবং বাইরে দূরে সান্টিং ইয়ার্ডে এঞ্জিনের হুইসল আর দলছাড়া মালগাড়ির ঘটাং ঘটাং আওয়াজ আরও বিরক্তিকর হতে থাকে।

পিছনে একটা ছোট্ট নদীও আছে। নামটাও ভারি ভালো। মৌরী। তার ওপারে দেবীবাবুর ফার্ম—খামার, পোলট্রি, ফিশারিজ। দেবীবাবুর মেয়ে সুশি—সুশ্বেতা কলেজের ছুটিতে বেড়াতে এসেছে বাবার ফার্মে। বিকেলে ব্রীজের ওপর তিউফাইণ্ডার হাতে যখন দাঁড়িয়েছিল সমুর সঙ্গে অবাঞ্ছিত দেখা হয়ে যায়। অবাক পরস্পর।···তুমি এখানে!

তুমি!

কী মুসকিল, আমাদের ফার্ম রয়েছে এখানে। ওই যে!

তাই নাকি? আমার আবার এক দাদা থাকেন স্টেশনের দিকে। রেলওয়ে ষ্টাফ।

বেড়াতে এসেছ তাহলে? বাঃ!

হ্যাঁ, জায়গাটা সুন্দর। প্রায়ই আসি।

এদিকে কোথায় এসেছিলে? জঙ্গল দেখতে নাকি?

এই ইয়ে—নাঃ। ঘুরছি।

চলো না সমু। জঙ্গলে ঢুকি। আমার একা একা যেতে ভয় করে।

ভয় কিসের? নৈমিষারণ্য—মানে নিরামিষ অরণ্য। বাঘভালুক তো নেই। খাবে না। বিষ্টিফিষ্টি হয় না বলে অনেক যত্ন করে গজানো হয়েছে।

যাঃ!

যাঃ নয়, সত্যি। সরকারী জঙ্গল তো!

হঠাৎ সমুর খেয়াল হয়, কাকে কোথায় যেতে বলছে এখন! শালা, মাথাটা কেমন গোলমাল হয়ে যায় মাঝে মাঝে। এটা ভালো নয়, মোটেও ভালো নয়। এই যেমন একটু আগে একটা মরা শুকনো লতা থেকে ছুরি চালিয়ে একটুকরো আর্ট কেটে নিয়েছে। আগের অভ্যাস। এবং সেই আর্টটা তখনো হাতে।···সুশি, এটা নেবে? নাও।

বাঃ! অপূর্ব! কোথায় পেলে সমুদা?

পেলুম। ইয়ে সুশি, সরকারের কটা সিংহ তুমি জানো?

কটা সিংহ মানে?

হুঁ, তিনটে। সুশি, সরকারী বনে আজ তিনটে সিংহই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। বাড়ি যাও।

সুশি হেসে খুন।···ভয় দেখানো হচ্ছে? সে আমি জানি বাবা জানি।

কী জানো বলো তো?

তিনটে সিংহই বানানো।

সুশি?

উঁ?

আসি।

না। একটু গল্প করো না বাবা। ঘুরতেই তো বেরিয়েছ।

সুশি, বাড়ি যাও। বাবাকে বোলো, বন্দুকে গুলি ভরে তৈরী থাকতে। আচ্ছা, চলি।···

পরে মনে হয়েছে, আগাগোড়া সব ডায়লগ টুকে নেয়নি তো সুশি! ও টুকলিফাই করতে ওস্তাদ। ওই করে বছর বছর পাশ করে আসছে। কিন্তু কী জ্বালা! এতদূর এসেও ফের সুশি! অবশ্য 'কাজ' না থাকলে, এবং সত্যিসত্যি মৌরীগ্রাম স্টেশনে সমুর মামা-টামা থাকলে, হঠাৎ এমন মধুরতম যোগাযোগে সে সুশিকে নিয়ে বনে ঢুকে যেত। এবং···

যাক্ গে দুরাশা।···

নদীর পাড় বেয়ে ঝকমকে পীচের পথ ঘোরালো। স্টেশনের কাছে পৌঁছেছে। হাইওয়েতে। রেললাইনের সমান্তরাল হাইওয়ে চলে গেছে দূরের রাজধানী থেকে আরো দূরের শহরে। বিস্তৃত শান্টিং ইয়ার্ডের মাঝেমাঝে একটা করে গোডাউন শেড। শেষ বেলায় হালকা চালে গতর দুলিয়ে কোথাও একজোড়া রাইফেলধারী গার্ড চলেছে পাহারার জায়গায়। ওভারব্রীজের ওপর কিছু ভ্রমণবিলাসী মানুষ। মফঃস্বল শহরটার পিছনে সূর্য ডুবছে। পূবের অরণ্যে তার

আলোর ছটা। এখানে ওখানে লাল ফুলের ঝলকানি। সবারই মনে পড়ে যায়, এ মাস ফুলের মাস। লাল ফুলের। ছোট স্টেশনবাবুর বউ—যাকে এখানকার কিছু ভালো লাগে না, কোয়াটারের পিছনে মাদারগাছের লাল ফুলগুলোর দিকে তারও তাকাতে ভালো লাগে। তারও মনে পড়ে যায়, আজ বসন্ত। আহা, এই বসন্ত!

দূরের রেলফটকে উনুন জ্বেলেছে কালী বেসরার যুবতী মেয়েটা। গাঁয়ের দিক থেকে সরু মাটির পথ রেললাইন পেরিয়ে বনের ধারে ধারে চলে গেছে কোথায় কোন ভিনগাঁয়ের দিকে। এই অবেলায় গরুর গাড়িতে হুল্লোড় করে কুটুম্বঘর চলেছে কারা। গাড়োয়ান বনের ধারে গিয়েই গরুর লেজ মুচড়ে গান ধরেছে।

সই আমার গঙ্গার জলো হে-এ-এ
সই আমার গঙ্গার কালো জল···

গঙ্গা আরো তিনমাইল পূর্বে। এ গাড়ি বন পেরিয়ে গঙ্গা পেরিয়ে কোথায় চলে যাবে—ঝিঁঝিঁডাকা নিঃঝুম রাত্তির, কোথায় কে কার জন্যে অপেক্ষা করে লণ্ঠন হাতে।

চিনু, নদীটা দেখেছিস? দেবীবাবুর ফার্মের নিচে?

আমি কিস্যু দেখিনি। আমি তো স্টেশন হয়ে এসেছি।

হুঁ। কা-লো জল!

লাল ফুল। কালো জল। পড়েছি পড়েছি মনে হচ্ছে রে।

বিদ্যাসাগর। ভাবা যায় না!

পান্নাদা, এবার টেট্টিদা যাক্। গাড়িটা···

যাবে? যাক। টেট্টি ভেইয়া!

বাবুজী!

ওঠ। ওদিকে আবার হ্যাঙ্গাম না বাধিয়ে বসে ছোটকুটা। লাইসেন্স তো তোমার কাছেই।

হাইওয়েতে মিথ্যে বিগড়ে বসে আছে একটা ট্রাক। বড় বড় কাঠের টব ভরতি—তেরপলের ছাউনি। ছোটকু একা পাহারা

দিচ্ছে। তার ড্রাইভার টেট্টি মিথ্যে মিস্তিরি আনতে গেছে মৌরীগ্রাম বাজারের দিকে। মাঝে মাঝে মিলিটারি গাড়ি যাচ্ছে হাইওয়েতে। ওদের জন্যে ভাবনা নেই। ভাবনা পুলিশের। তবে পুলিশ—পুলিশ কী করবে? ছোটকুটা দারুণ ঘড়েল।

বিশাল বটের ছায়ায় ট্রাকটা অপেক্ষা করছে। পিছনে পুকুর। তার ওদিকে আম নারকেলের বাগান। এদিকে গভীর নয়ানজুলির পর উঁচু রেললাইন—শান্টিং ইয়ার্ড—তারপর রেলওয়ের ফিসারিজ। প্রকাণ্ড খাল, তার পাড়ে সরু পীচের পথ এবং সরকারী বন।

পান্নাদা, মিসটার এখনও এল না।

ডাউন তো এখনও পাস করল না। আসবে কিসে? গাড়ি লেট আছে।

স্টেশনে যাব একবার?

চুপচাপ বসে থাক্ তো বাবা।

মিস্টার না এলে তো···

চিনু, ছোঁড়াটা তো বড্ড জ্বালাচ্ছে। ওকে থামাতে পারিস?

ফারুক হেসে উঠল। বন্দুকটা দেখতে থাকল। সমু উঠে দাঁড়াল হঠাৎ। আড়ামোড়া দিল। তারপর দেখল, শিমূল ডালে কয়েকটা শকুন চুপচাপ বসে আছে। সে পান্নাদার দিকে এগিয়ে বলল, হেগে দেবে। সরে যান।

পান্না ঘাড় তুলে শকুন দেখল। সরল না।

হিকি ডাকছিল শিস দিয়ে।

সমু এগোল।—হ্যাল্লো ডার্লিং!

হোয়াট হ্যাপনড?

দোজ ভালচারস। লুক।

তুম দেখো।

ক্যা শোচ রাহা, ইয়ার?

নাথ্‌থিং।

পান্নার আওয়াজ এল।···সমু, হিকিকে আসতে বল্।

হিকি, ওস্তাদ কলিং।

হেই ম্যান!

কাম হেয়া, মাই বয়। লেটস্ টক।

হোয়াট এ্যাবাউট?

দি গেম।……

ছোট ষ্টেশনবাবুর বউ সবে রান্না সেরে জানালার পাশে এসে বসেছে। ঝি থালাভরতি ভাত তরকারি আঁচলে ঢেকে নিয়ে বাড়ি চলে গেল। বলে গেল, এখন ক'দিন আসবে না। শুনে রাগ হয়েছে। রেডিওর চাবি ঘুরিয়ে কলকাতায় রাখল অনু—অনুরাধা, যে ছোটবাবুর বউ। রবীন্দ্র সঙ্গীত শোনা গেল—আজ জ্যোৎস্নারাতে সবাই যাবে বনে…এবং অনু জানালায় উঁকি মেরে আদিগন্ত ফাঁকা রাত্রির আকাশে সত্যি-সত্যি চাঁদ উঠেছে কিনা দেখে নিল। ওঠেনি। সে হাত বাড়িয়ে প্রকাণ্ড একটা বাংলা উপন্যাস টেনে নিল। সেই ছেলেটা আর সেই মেয়েটা…স্বামীর ঘরে এসেও ছেলেটাকে ভুলতে পারছিল না, এমন সময় ছেলেটা হাজির, স্বামী বাসায় নেই, এবং ছেলেটা…এই মা! কী অশ্লীল কথা বলছে…

কোথাও আওয়াজ হল গুড়ুম গুম্! আবার। আবার। সবে হাওয়া ফের চনমনিয়ে উঠেছে। আওয়াজ অস্পষ্ট। কিন্তু পর পর গুড়ুম গুম্। ফট্ ফটাস্। বাজি খেলছে নাকি?

মেয়েটা (কী লজ্জার কথা!) রাজী। খাটে…হঠাৎ দরজায় খটখট কড়া নাড়া। কে? আবার কে? স্বামী। না তো! কানের ভুল।

কোথাও আবছা চেঁচামেচির আওয়াজ। আবার—গুড়ুম গুম্! ফট্ ফটাস্।

রেডিওর চাবি বন্ধ করে অনু কিছুক্ষণ উৎকর্ণ হল। চেঁচামেচি

হচ্ছে সত্যি-সত্যি। কোয়াটার নিচুতে—রেললাইন উঁচুতে। কিচ্ছু দেখা যায় না। চোখ জ্বলে যাচ্ছে আলোর ছটায়। পাশের কোয়াটারের জানালা থেকে রেখার সাড়া পাওয়া গেল, বউদি, বউদি, অ-বউদি।

অনু বলল, রেখা? কী হয়েছে?

শুনতে পাচ্ছেন না?

শুনছি। বাজি খেলছে।

আপনার মাথা। মারামারি হচ্ছে।

যাঃ।

সামান্য দূরে ওভারব্রীজটা। সেখান থেকে কে চেঁচাচ্ছিল—ওই যে, ওই যে! পালাচ্ছে, পালাচ্ছে! রামবাহাদুর, ঘোলি করো। রামবাহাদুর।

গুড়ুম গুম্। গুড়ুম গুম্। এবং ফট্ ফটাস্।...

আদিখ্যেতা। অনু রেগেমেগে রেডিওর চাবি খুলল। ফের সব আওয়াজ ডুবে গেল। এবং উপন্যাসের পাতায় লোভী কিন্তু সলজ্জ চোখ দুটো রাখল সে। যাঃ, পাতাটা উড়ে গেছে। কোথায় আছে সেই ব্যাপারটা—ছেলেটা এবং মেয়েটা—অশ্লীলতা এবং স্বামী এসে পড়ল। স্বামী না এসে পড়লে কি সত্যি-সত্যি ব্যাপারটা অশ্লীল মনে হচ্ছিল? এটা ভাববার বিষয় কিন্তু।

ছোটিমাইজি, ছোটিমাইজি!

কে?

রামশরণ, ছোটিমাইজি। দরওয়াজা আচ্ছাসে বন্ধ্ কিজিয়ে। ছোটাবাবু বোলা। মৎ ডরিয়ে।

কেন?

উধার কই ঝামেলা হোতা। বাবু হামকো ভেজা—

যাও, তোমার বাবুকে নিজের প্রাণ বাঁচাতে বলো। আমি ভালো আছি।

জী ছোটিমাইজি।

রামশরণ, গেলে নাকি ?

নেহী—বোলিয়ে।

বাবু খেতে আসবেন কখন ?

দের হোগা—মালুম হোতা। বড়া জংসিনসে ফোর্স আনা পড়ে—তবতক্...

ঠিক আছে। যাও।

বাবুজী হামকো হেঁয়া রহনে বোলা, ছোটিমাইজি।

ঢঙ্ একটা। তবে বসে থাকো দরজার বাইরে। আমি উঠতে পারছি নে।

লোকটা ভুতুড়ে লণ্ঠন নিয়ে দরজার বাইরে ধাপের ওপর বসে পড়ল সম্ভবত। অনু উপন্যাসে চোখ রাখল। আরে, সে পাতাটা কোথায় গেল ? এখানটা অন্যরকম। স্বামী-স্ত্রী শুয়ে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলছে। সেই মেয়েটিতো ? হ্যাঁ। দিব্যি স্বামীর বুকে চিবুক ঘষে বলছে...উঃ, কী মিথ্যেবাদী মেয়ে রে বাবা।

অনু হঠাৎ মুখ তুলে তার সংসারটা দেখে নিয়ে মনে মনে বলল, আমি সতীলক্ষ্মী। একটু হাসলও। ঠোঁটের কোণে সে হাসির কাঁপনটা সূর্যাস্তের পরও লালচে রঙটুকুর মত লেগে রইল। নতুন আলনায় নতুন কাপড়। নতুন খাটে নতুন বিছানা। চকচকে কালো জুতোগুলো কুকুরের মত দেখাচ্ছে। হাঁ করে হাঁফাচ্ছে যেন। হ্যাঙ্গারে কালো রেলকোট অদৃশ্য ছোটবাবুটিকে দাঁড় করিয়ে রেখেছে। কী দেখছ ছোটবাবু ? অনু সতীলক্ষ্মী। তার ঘরে আগের দিনের প্রেমিক আসে না। আসলে, কোন প্রেমিকই ছিল না তার। চাপা কপাল, পুরু ভুরু, বেঁটে নাক—আর এই মুটকি দেহ। তাদের প্রেমিক থাকে না। অথচ কেউ কেউ বলেছিল, অনু হাসলে ওর দেহটাও হাসে।

আজ রাতে ছোটবাবু-বড়বাবু ভীষণ ব্যস্ত। কোথায় কী হ্যাঙ্গামা হয়ে গেল। বড় জংশন থেকে ফোর্স আসবে। তার আগে মৌরীগ্রামের এই কোয়াটারে এসে যেত যদি কোন প্রেমিক।

অনু, তুমি কী করতে? না—হাসির কথা নয়। কোন কোন মেয়ের জীবনে এ তো একটা মারাত্মক ব্যাপার। একটা চরম পরীক্ষা। বিয়ের আগে যাকে ভেবেছিলে সত্য, বিয়ের পর কি সে মিথ্যে হয়ে যাবে? যার বুকে মাথা রেখে বলেছিলে, তুমি ছাড়া আমার জীবন শূন্য হয়ে যাবে—সে এল তোমার স্বামীর সংসারে, এমনি নির্জন রাত্তিরে। ইস্ কী নির্লজ্জ দেখাবে তোমায়।

অনু আশ্বস্ত হয়ে ভাবল, দূর ছাই। আমার তো ওসব ঘটেনি। তবে ভাবনা কিসের?

দেবীবাবু এ্যালসেশিয়ানটার গলা থেকে চেন খুলে নিয়ে বললেন, সুশি, শুয়ে পড়। রাত্তির হয়েছে।

সুশি বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসে ছিল। সে দেখল, কুকুরটা লাফ দিয়ে উঠোনে নামল। তারপর ওদিকে ফুলগাছের ভিতর অদৃশ্য হল। সারারাত সে ঘুরে বেড়াবে চুপচাপ। হিংস্র জাগ্রত সতর্ক একটা জানোয়ার। বাইরের কেউ জানবে না—কী আছে অপেক্ষা করে তার জন্যে। ব্যাপারটা ভাবতে সাংঘাতিক লাগে।

সুশি, ঘুম পায় না?

বাবা তাকে হাসাল। বাবা এই জংলী জায়গায় পড়ে থেকে পুরো প্রিমিটিভ মানুষ হয়ে গেছে। সবে তো আটটা বেজেছে। এখুনি ঘুম পাবে কী। অবশ্য এরই মধ্যে চারদিকে ঘন ঝুপসি অন্ধকার। সামনে ফাঁকা মাঠ। কোথাও কোন আলো নেই। এক আলো বলতে ওই পুবের আকাশে নক্ষত্র। হাওয়া বইছে শনশনিয়ে। পিছনে নারকেল গাছের পাতা দুলে দুলে শব্দ করছে সারাক্ষণ। ডাইনে শিরিষ, বাঁয়ে পাঁচিলের গায়ে অশোক—তাদের দুলন্ত ডালপালার ভিতর মাঝে মাঝে প্যাঁচা ডেকে উঠছে। কী ভুতুড়ে জায়গায় না বাবা থাকেন!

কেন ? না—টাকার লোভে। টাকা শব্দ এ্যাদ্দিন ছেলেবেলা থেকে খুব সম্ভ্রান্ত শব্দ মনে হত—বিশেষ করে মানুষ শব্দের পাশে বসলে। আজকাল উল্টো লাগে। মানুষের পাশে টাকা বসলেই হয়ে ওঠে একটা প্রিমিটিভ ব্যাপার—বন্য, হিংস্র, ওই কুকুরটার মত কী যেন ওঁৎপেতে থাকা জানোয়ার।

কিন্তু এ শিক্ষা তাকে অন্য কেউ দিয়েছিল। হিরণ কিংবা দেবু—কিংবা ওরা সবাই মিলে। হিরণ দেবু—সবাই আজ কোথায় গা ঢাকা দিয়ে আছে। ওরা নাকি বিপ্লবী। ওরা বলেছিল, যতক্ষণ না বিপ্লব শেষ হচ্ছে, ততক্ষণ লেখাপড়া-টড়া সব ভুল। সবকিছুই ভুল। যাক্ গে বাবা। আমার অত বড় বড় কথার দরকার কী ? বেশ তো আছি।···সুশি বলল, বাবা, তুমি কি এক্ষুণি শুয়ে পড়ো ? রোজই ?

দেবীবাবু সস্নেহে হাসলেন।···নাঃ। আমার ঘুমোতে নেই। এত সব রেখেটেখে ঘুমোবার কি যো আছে ? তাতে দিনকাল যা পড়েছে !

সুশি বলল, সারারাত্তির জেগে থাকো বুঝি ? শরীর খারাপ হবে যে ?

নাঃ ! অভ্যাস। একটু পরেই হাতেম মিয়া এসে যাবে। তখন দুজনে দাবা নিয়ে বসব।

সে আবার কে ?

ভুলে গেলি তোর হাতেমচাচাকে ? সেই যে মুসলমান ভদ্রলোক—পায়রাডাঙার !

ও ! সেই মোটর সাইকেল আর বন্দুকের গপ্প !

মনে পড়েছে তাহলে ?

বাবা, তুমি তো জোতদার।

কে জানে !

সেই মুসলমান ভদ্রলোকও তো জোতদার ?

হুঁউ। কেন ?

তোমাদের মাথা কাটবে না কেউ ?

হা হা করে হেসে উঠলেন দেবীবাবু। তাঁর এই মেয়েটি সময়-সময় বড্ড ন্যাকান্যাকা কথা বলে। যত সব খারাপ কথা তার মুখে মধু মেখে মিঠে হয়ে বেরিয়ে আসে। বললেন, সুশি, তুই আবার রাজনীতি করছিস নে তো ?

ভাল্লাগে না।

চল্, ঘরে গিয়ে বসবি। এখনও ঠাণ্ডা যায়নি। এদিকে গরম বেশ দেরীতে পড়ে। অসুখবিসুখ হতে পারে। ওঠ্।

সুশি হঠাৎ কান খাড়া করে বলল, কিসের শব্দ হচ্ছে বাবা ? অনেকবার শুনলুম। কখন থেকে হচ্ছে।

দেবীবাবুর মুখটা কেমন বদলাল সঙ্গে সঙ্গে। কান খাড়া করে থাকলেন। তারপর বললেন, কে জানে! আমারও যেন কানে যাচ্ছিল। ব্যাটা বাতাসের আর সময়-অসময় নেই। কিছু শোনার যো—মাধো সিং ?

সাড়া এল—জী, সাব।

কই আওয়াজ শুনা ?

হাঁ সাব।

তো বোলা নেই কাহে ?

ইস্‌তরফ নেহী সাব। বহৎ দূরকা।

তা দূরেই হোক, আর কাছেই হোক। আওয়াজ তো বটে। কিসের আওয়াজ ?

গোলি ঔর বোমাকা।

সাচ ?···লাফ দিয়ে ঘরে ঢুকলেন দেবীপ্রসাদ। তারপর সবাইকে অবাক করে বন্দুক ছুঁড়ে বসলেন বারান্দা থেকে। স্তব্ধতা ভেঙে খানখান হয়ে গেল। সুষম বিন্যাসটা ভেঙে গেল প্রথম রাত্রির। কিছু পাখি শব্দ করে উড়ে গেল। কুকুরটা দৌড়ে এসে পায়ের কাছে গরগর করতে থাকল।

অন্য একটা আওয়াজ আসছিল দূর থেকে—চাপা গুরগুর গর

গর। হাতেম মিয়া আসছেন মোটর সাইকেলে। পিঠে বন্দুক গায়ে ওভার কোট। ফেরার পথে শীত লাগে। হাতে টর্চ।··· ব্যানারজি।

হ্যাল্লো, চৌধুরী! ওদিকে কী হয়েছে?

কিসের?

কী যেন আওয়াজ শুনলুম। মাধো সিং বলছে, গুলি বোমা চলছে নাকি!

ও। না—ইয়ে, শুনলুম, ওয়াগান ব্রেকারদের সঙ্গে লেগেছিল রেলপুলিশের। কাল পুরো খবরটা পেয়ে যাব। মিছেমিছি রাত্তিরবেলা আর দৌড়লুম না ওদিকে।···

সুশি অকারণ চমকাল। খবরের কাগজের পাতায় এসব খবর সে প্রতিদিনই পড়ে। খুব কৌতূহল হয় দেখতে—কারা এসব করেটরে? কেমন তাদের চেহারা? সমুর মত কি? কিছুদিন আগে সমুর একটা কাণ্ড দেখেছিল সে। আনোয়ার শা রোডে সুশিদের বাড়ি। পিছনে গলি। দুদলে সংঘর্ষ হচ্ছিল তখন। হঠাৎ গলির ওপর জানালা থেকে সুশি অবাক হয়ে দেখেছিল—একদল ছেলের মধ্যে সমু যাচ্ছে, তার হাতে একটা···হ্যাঁ, পিস্তলটিস্তলই হবে। অথচ অভ্যাসবশে প্রথমে ভেবেছিল, ওটা সমুর একটা 'আর্ট', কোন গাছের কিম্ভূত গড়নের ডালপালা, নয়তো শিকড়—ওর ন্যাচারাল আর্টের কালেকশন একটা। তা নয়, সত্যিকার পিস্তল। কথাটা মাকে বলেছিল সুশি। মা বলেছিল, সমু ভালো ছেলে নয়। তুই তো ওর সঙ্গে মিশিস! খবরদার, আর কখনো মিশবিনে।

সুশি বলেছিল, আমার বয়ে গেছে মিশতে।

অনেকদিন সত্যি মেশেনি সে। সমুকে সে দেখলে এড়িয়ে গেছে। এবং সমুও অবশ্যি তার দিকে তেমন গা করে না কোনদিন। কিন্তু আজ ব্যাপারটা কী হল? সমুর মামাবাড়ি ষ্টেশনে। সমুর সঙ্গে কেমন চমৎকার জায়গায় দেখা হয়ে গেল। সুন্দর ব্রীজ।

কালো জল। সবুজ বন। লাল ফুল। কী ভালো না লাগছিল। হ্যাঁ, এটা হয়। চেনা কাউকে বিদেশেবিভুঁয়ে দেখলে হয়তো এমনটা হয়। ভালো লাগে। বেড়াতে ইচ্ছে করে তার সঙ্গে। আর কী নির্জনতা, কী ছায়া।

সকালে ষ্টেশনের দিকে চলে যাবে সুশি। যদি দেখা হয়ে যায় ফের!

হাতেম চৌধুরী বলল, সুশি-মা যে! কখন এলে?

সক্কালে।

কলেজ বন্ধ?

হুঁউ।

আমার মেয়ে নাজমা—নাজমারও কলেজ বন্ধ। বেশ আছে সব। কাল এক সময় ওকে আসতে বলব। তোমার সঙ্গে ভাব হয়ে যাবে, দেখবে।

সুশি অকারণ খুশি হয়ে বলল, বলবেন কিন্তু।··

সমুটা যা হাসাতে পারে! তিনটে সরকারী সিংহ জঙ্গলে ছেড়ে দিয়েছে! আমার জবাবটাও কেমন দারুণ—তিনটে বানানো সিংহ! ··সুশি ডাকল, বাবা!

কী রে? শুবি?

কাল আমার চেনা একটি ছেলে আসবে। এখানে খাবে কিন্তু।

কে রে?

তুমি চিনবে না। আমাদের পাড়ায় থাকে। সৌমেন নাম। এখানেই বেড়াতে এসেছে।

বেশ তো! আসুক।

বাবা, কাল সকালে তোমার জিপটা পাব?

কেন? জিপ তো এখনও গ্যারেজে পড়ে আছে। কাল পাব কি না কে জানে।

সুশি মনমরা হয়ে গেল। যাক্ গে। ষ্টেশনষ্টাফ বলছিল—

কোয়াটার খুঁজে বের করা এমন কিছু অসম্ভব নয়। সকাল হোক।...

মৌরীগ্রাম ষ্টেশনের ছোটবাবু নিরঞ্জন ধাপে ধাপে নেমে এল। সামনে প্রশস্ত চত্বর—মধ্যিখানে গোল একটুখানি পার্কমতো। সেখানে একটা পামগাছ। আলো পড়েছে ঘাসের ওপর। কয়েকটুকরো কাগজ আর একটা ময়লা ন্যাকড়ার পাশে পাগলটাগল কেউ ঘুমিয়ে আছে। খারাপ লাগল নিরঞ্জনের। সাদা ঝকমকে নিয়ন আলোর নিচে পামগাছকেন্দ্রিক সবুজ বৃত্ত আর কারুকার্য-খচিত রেলিং এই মধ্যরাতে হঠাৎ দ্বীপের মতো লাগে—সেখানে একটা নোংরা মানুষ শুয়ে থাকবে কেন? নিরঞ্জনের অবশ্য এখন ঘরে ফেরার তাড়া। তার চোখদুটো উদাস হয়ে আসছিল। চারপাশে নিশ্চুপ রিকশোর জটলা আর ম্রিয়মান কিছু খাবারের দোকান। সম্ভবত হ্যাঙ্গামার খবরে এই নির্জনতার উদ্ভব। বাঁচা গেছে! নিরঞ্জন অকারণ চটিতে শব্দ তুলে ডানহাতি ঘুরে কোয়াটারের দিকে চলল। প্রকাণ্ড শিরিষগাছের নিচেটা অন্ধকার হয়ে আছে। সরু পথটা ইঁটে বাঁধানো। একটুখানি ভয়-ভয় করল—কিন্তু অনু, অনুর কথা ভেবে তার আনন্দ—এবং এই আনন্দ খানিকটা যৌনতারও, নিরঞ্জন যত তাড়াতাড়ি পারে হাঁটতে থাকল। তার মনটা প্রতিমুহূর্তে দেহসর্বস্ব হয়ে পড়ছিল। শিরিষতলার ওদিকে ঘন রাঙচিতা বেড়া, ম্যাগনো-লিয়ার ঝাঁপি, কিছু বুগানভেলিয়া, ঝাউ, ক্যাকটাস। ডাইনে উঁচুতে রেললাইন—যার গা বেয়ে চাপবাঁধা আগাছা, বনবাবলা, পেত্নীঝোপ, কালকাসুন্দে, ঘেঁটুফুলের জঙ্গল। প্ল্যাটফর্ম থেকে লোকেরা হিসি করে। তার ফলে জঙ্গলের নিচের মাটিটা দিনেদিনে জ্বলেপুড়ে যাচ্ছে। আর দুর্গন্ধ! ছ্যা ছ্যা, এখানকার লোকগুলো বড্ড অসভ্য। ভোরবেলা ওখানটায় তাকানো যায় না। নির্লজ্জের

মত নাকটা ঢেকে দিব্যি সব তাকাবে কুতকুতে চোখে—মানে, বসে থাকা সেই অসভ্যগুলো, এবং ট্রেন থেকে যাত্রীরাও দেখবে। মানুষের এইসব ব্যাপার কেন থাকে? নিরঞ্জন দীর্ঘশ্বাস ফেলল—হঠাৎ এসে পড়ল দীর্ঘশ্বাসটা। শরীর! শরীর কেন আছে? শালা, দিনরাত্তির এই ঝকমারি—পোষাক পরা, খাওয়া দাওয়া, মলমূত্র ত্যাগ, চাকরী-বাকরী,···কত রকম! অনু বলে, তুমি ভীষণ আলসে মানুষ। অবশ্য একটা দিকে···অনু হাসে এবং এত অশ্লীল!

কোয়াটারের ও মুড়োয় একটা লাইট পোস্ট মাত্র—সেও ম্যুনিসিপ্যালিটির। রাস্তার আলো।

এত লেখালেখি করেও রেলওয়ে আলো দিল না এখানটায়। অবশ্য কোয়াটারে দিয়েছে। আবছা অন্ধকারে নিরঞ্জনের হঠাৎ সাধ গেল সিগ্রেট খেতে। সিগ্রেট খেতে-খেতে বাসায় ঢুকবে। অনুকে ডাকতে সময় লাগবে কিছু! রামশরণ নির্ঘাৎ কেটে পড়েছে এতক্ষণে। কাটবার জায়গা থাকলে নিরঞ্জনও কি কাটত না? পৃথিবীটা যার কাছে শুওরের খোঁয়াড়! শুধু যৌনতা বাদে যখন সবকিছুই বিস্বাদ লাগে!

কে একজন সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তখনই টর্চটার কথা খেয়াল হল। স্টেশনঘরের টেবিলে পড়ে আছে। নাকি সিগনালবাবুর সেই পাগলাটে শালাটা? ব্যাটা ভুত কাঁহেকা! নিরঞ্জন বলল, ছক্কাবাবু নাকি?

উঁহু। আমি।

বুক ছ্যাঁৎ করে উঠল নিরঞ্জনের। গলাটা চেনা মনে হল।·· কে, কে?

আস্তে। আমি পান্না।

শব্দহীন লম্বা পায়ে এগিয়ে গেল নিরঞ্জন।···পান্না! কী ব্যাপার? তুমি এখানে?

তোর কাছে।

কী—কেন?···নিরঞ্জনের বুকে ঢেঁকির পাড় পড়ছিল।

সময় কম। শোন্। এ আজ রাত্তিরটা তোর এখানে থাকবে। কালই নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করব। যেন কোন অসুবিধে না হয়। আর···

নিরঞ্জন চারপাশে তীক্ষ্ণদৃষ্টে তাকিয়ে কাকেও দেখতে পেল না।

আর তোর তেমন কিছু ঘটলে বলবি, তোর মাসতুতো ভাই। বউকেও বলে দিবি। সাবধান।

পুতুল হয়ে গেল নিরঞ্জন। চোয়াল আঁটো হয়ে গেল।

তুই এগো। ওকে নিয়ে যাচ্ছি। নামধাম সব জেনে নিবি ওর কাছে। দরকার হলে···

উঁ?

থাক্। ডাক্তার-টাক্তার লাগলে সে আমিই পাঠাবখন। কোন প্রশ্ন করবিনে। কেমন?

হুঁ।

হুঁ নয়, পান্না তোকে বলছে।

বেশ তো!

এগো, যাচ্ছি।···

অনু লেপটা পায়ের দিকে ঠেলে দিল। নিরঞ্জনের শ্বাসপ্রশ্বাসে বড্ড দুর্গন্ধ—ওর নির্বোধ ঘুমন্ত মুখটাও দিল সরিয়ে। ঘুম আসছেনা। উপন্যাসের সেই পাতাটা ঘুম আর জেগে থাকার মাঝের জায়গায় ওড়াউড়ি করছে—ছেলেটা এল, স্বামী ঘরে নেই, মেয়েটা কী করল···

অনু আস্তে আস্তে উঠল। পাশের ঘরে যেতে ইচ্ছে করল। সম্পর্কে নাকি মাসতুতো দেওর—পায়ে ব্যাণ্ডেজ নিয়ে ছেলেটি ঘুমোচ্ছে। ব্যাণ্ডেজ কেন? নিরঞ্জন চোখটিপে বলেছে, পরে বলব'খন। তারপর ঘুমিয়ে পড়েছে। বন্ধ দরজার কাছে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে অনু ফিরে এল। হঠাৎ মনে হল নিরঞ্জন আসলে কে?

দুই

সকালে সাইকেল চেপে একটি মেয়ে এল। পরনে ফিকে সবুজ সালোয়ার, বেগুনি ঢিলে পাঞ্জাবী, গলায় জড়ানো সাদা নাইলন উড়নি, পায়ে লাল ফুলকাটা নাগরা। হাতে চুড়ি-টুড়ি নেই, একটা মোটা ব্যাণ্ডওয়ালা ঘড়ি। কানে মোটা চাঁদির রিঙ। লম্বাটে শরীর। মুখখানাও তাই। কপালে একচিলতে লাল রেখা। ববছাঁট ফুরফুরে চুল চৈত্রের হাওয়ায় খুশিখুশি দেখাচ্ছিল।

সুশি দূর থেকে দেখছিল ওকে। ভেবেছিল পাঞ্জাবী মেয়ে—নয়তো মাড়োয়ারি। হঠাৎ সাইকেল এসে থেমে গেল গেটে। অমনি সুশির খেয়াল হল। দৌড়ে গিয়ে বলল, আরে, আসুন আসুন।

আসছি। কিন্তু কে আমি বলুন তো?

মেয়েটির আপেল মুখের শ্রী, আর বড়-বড় চোখে পৃথিবীর জন্যে ভালবাসা নাকি ঝরে পড়ছে। সুশি গেট খুলে বলল, চিনি। আর কথা নেই, ব্যস।

হুঁউ।···সাইকেল থেকে নামল ও। হাসতে হাসতে বলল, আপনি তো ভারি ভালো। ভেবেছিলুম, কলকাতার মেয়ে—ভীষণ, ভী—ষ—ণ···

কী?

থাক্‌গে। কাকু কেথায়?

বাবা? স্টেশনের ওদিকে গেছেন। জীপ আনতে। গ্যারাজে সারানো হচ্ছে।

আমার নামটা আপনি জানেন না কিন্তু।

জানি। দাঁড়ান, একমিনিট···বলছি।

হয়েছে।···ও হেসে উঠল···মুসলমানদের নাম হিন্দুরা উচ্চারণ করতেই পারে না।

সুশিও হাসল।···পারে না বুঝি? আমি তো পারি। আমার অনেক বন্ধু আছে—বেবি আনোয়ারা, আর···এই! আপনার নাম নাজমা!

খুসি হলুম।

সুশি ওর হাত ধরে বারান্দায় উঠল। বলল, বসুন। উঃ, সত্যি মরে যাচ্ছিলুম কাল থেকে—আপনার দিব্যি। বাবার এখানে আসা মানে তো পুরো নির্ব্বাসন! না এলেও বাবা রাগ করবেন! দিন কাটতে চায় না একেবারে।

নাজমা চাদ্দিকটা দেখছিল। বলল, বাবার সঙ্গে আমি প্রায়ই আসি এখানে। ওই ফরেস্টের পাশে নদী আছে না? ব্রীজে দাঁড়ালে এত ভালো লাগে—ভাবা যায় না!

এই, আপনাদের কলেজে কোএডুকেশন নাকি?

হ্যাঁ। কেন?

সুশি চোখ টিপে দুষ্টুমি করে বলল, ছেলেদের সঙ্গে মিশতে হয় নিশ্চয়?

হয় বইকি।

ওরা দুষ্টুমি করে না?

নাজমা একটু লজ্জা পেল।···নাঃ, তা কেন?

সুশি সংযত হয়ে বলল, এমনি বলছিলুম। আমার কোন ধারণা নেই তো! যাক্‌গে—আপনাদের বাড়ি এখান থেকে কদ্দুরে?

নাজমা আঙুল তুলে দেখাল।···এই তো—মাত্র তিনমাইল। খুব বড় গ্রাম। যাবেন তো? যেতে হবে আমার সঙ্গে। না গেলে ভীষণ রাগ করব কিন্তু। পাশেই গঙ্গা—এত ভালো লাগবে আপনার।

সুশি বলল, যাবো। জিপটা আসুক।

জিপ-টিপ কেন? আমার সাইকেলে যাবেন।

সুশি অবাক হয়ে বলল, পারবেন?

হুঁ-উঁ। আমি স্পোর্টস নিয়ে থাকি যে—সাঁতারে এবার ডিস্ট্রিক্ট্ চ্যাম্পিয়ন হয়েছি।

সুশি সপ্রশংস তাকাল।...আর কী খেলেন?

অনেকরকম। থাক্‌গে। আপনাদের মুরগীর ঘর দেখব চলুন। মা বলে দিয়েছে, একটা ভালোজাতের বাচ্চা নিয়ে যেতে। কাকু ততক্ষণে এসে পড়বেন।

যাচ্ছি। বসুন না একটু।...সুশি উঠে দাঁড়াল। ডাকল, যোগীদা, যোগীদা!

কিচেনের ওদিক থেকে সাড়া এল—মামণি!

গেষ্ট্ আছে একজন। শিগগির কিন্তু।

দেখেছি।

নাজমা বলল, আরে—সে হচ্ছে। ওগুলো বুঝি সদ্য ফুটেছে? কী ফুল?

সুশি লক্ষ্য করে বলল, জানিনে। বাবার নেশা। আচ্ছা নাজমা, আপনি কি সব সময় সালোয়ার পরে থাকেন?

নাজমা সলজ্জ বলল, না—না। সাইকেল চাপবার সময়। শাড়িই পরি।

প্যান্ট পরলেও পারেন। আজকাল প্যান্টশার্ট পরছে সবাই।... সুশি গম্ভীর হয়ে বলল।

আপনি সালোয়ার পাঞ্জাবী পরেননি কখনও?

পরেছি। অনেক আগে।

নাজমা উঠে দাঁড়াল।...ধুৎ! ভাল্লাগে না। চলুন না—ফরেষ্টের দিকে ঘুরে আসি। আপনি তো কিচ্ছু চেনেন না এখানে। চলুন, সব চিনিয়ে দেব।

সুশি বলল, যাচ্ছি। যোগীদা, শিগগির।...আচ্ছা নাজমা, ফরেষ্টে কোন বাঘটাঘ নেই? কোনসময় ছিল না?

নাজমা হেসে ফেলল।···যান, কী যে বলেন। ওতো সাজানো বাগান। তবে অনেক পাখিটাখি আছে। খরগোস আছে। একবার একটা বনবেড়াল মেরেছিলুম বন্দুকে।

সুশি চমকে উঠল।···বন্দুক? আপনি বন্দুক ছুঁড়তে পারেন?

হুঁউ। ছেলেবেলা থেকে বাবা শিখিয়েছেন।·· নাজমা স্বাভাবিক চপলতায় বলতে থাকল।···জানেন, আমার কোন ভাইটাই নেই। তাই বাবা-মার কাছে আমিই তাদের ছেলে। কী কাণ্ড! বাবা বলেন, যে যুগ পড়েছে, জোতজমা রাখতে হলে বন্দুক চালাতে হবে। নাজমাকে তাই তৈরী করছি।···নাজমা হেসে উঠল।

সুশি হাসল না। সে তার বাবার কথা ঝটপট ভেবে নিল। সেও তো একা—বাবা-মার কাছে সেও হয়তো একটা ছেলের মতো। কিন্তু বাবা তো তেমন কথা বলেন না কোনদিন? বরং নাচগান পার্টি-ফার্টিতেই বাবার উৎসাহটা বেশি। বাবা বলেন, আর্টিষ্ট হতে হবে। পৃথিবীতে আর্টিষ্ট যে নয়, সে পুরো মানুষ নয়।···সুশি বলল, আপনি তাহলে···

হঠাৎ থেমে গেল সে। নাজমা বলল, তাহলে কী?

সুশি ফিক করে হাসল।·· শ্রেণীশত্রু—নাম্বার ওয়ান।

নাজমা বলল, ও, বিপ্লব! এদেশে বিপ্লব আসবে না। বাবা বলেন—ওসব এদেশে হবে না।

তাই বুঝি?···সুশি ঠোঁট কামড়ে কী ভেবে ফের বলল, আচ্ছা নাজমা, বিপ্লব যদি সত্যি আসে, আপনি কী করবেন?

নাজমা তর্কের ভঙ্গীতে বলল, বিপ্লব বলতে কী বোঝেন?

অত জানিনে। এই—মারামারি খুনোখুনি হবে, আগুন জ্বলবে···

যোগী ট্রে হাতে এল। নাজমাকে দেখে বলল, বেগমসাহেবা যে! কুর্নিশ! ···এবং ট্রে রেখে সে সত্যি ঝুঁকে সকৌতুকে কুর্নিশ করল।

নাজমা বলল, জানেন সুশ্বেতা, যোগীকা থিয়েটার করে? গত পূজোয় ষ্টেশনবাজারে সিরাজদ্দৌলা হল—ও সেজেছিল গোলাম-হোসেন। পার্টটা একবার বল না যোগীকা?

যোগী থিয়েটারি ঢঙে—'বান্দার গোস্তাকি মাফ কিজিয়ে মেহেরবান'—বলে পিছু হটে, তারপরে লম্বা পা ফেলে চলে গেল। এরা হাসতে থাকল। ট্রে ভরতি ডিমের মামলেট, চা, কাটাকুটি সরস ফল। আলগোছে একটা ফলের কুচি ঠোঁটে রেখে দূরের দিকে তাকিয়ে নাজমা বলল, আপনি জাত মানেন না সুশ্বেতা—কিন্তু অনেকে···

সুশ্বেতা করল কী, হঠাৎ ওর হাত থেকে ফলের কুচিটা কেড়ে নিয়ে মুখে দিল।···এই তো দেখছেন!

আরে, আরে!

সুশি মুখ নীচু করে চায়ের কাপে ঠোঁট ঠেকিয়ে খুব আস্তে বলল, কথা হবে পরে। খেয়ে নাও তো। আমরা আজ সারাদিন টো টো করে ঘুরব।

এই আদ্যিকালের বটগাছটা কেন্দ্র করেই গজিয়ে উঠেছিল এ বনভূমি—বাইশ বছর আগে। আজ এ বন সত্যিকারের বন হয়ে উঠেছে। শাল সেগুন শিশু—হরেক জাতের গাছের ফাঁকে অন্তজ শ্রেণীর অজস্র গাছকেও সরকারী লালফিতের অজুহাতে বাড়তে দেওয়া হয়েছে। নিচে আছে আগাছার ঝোপ। লতাপাতার বুনশি। ছায়া-ছায়া অন্ধকারে পোকামাকড় ঘোরে। আর বটগাছটা এখনও বেঁচে থাকল। অনেকগুলো ঝুরি তার। কোটরে সাপ আর প্যাঁচা থাকে। একপাশে বাজপড়ার কালো দাগ। সেখানে মস্তো ফোঁকর। নিচে উইঢিবি। তার ওপর উবুড় হয়ে কেউ পড়ে আছে।

ওই তো ইনদা! প্রান্না বোস এক দৌড়ে কাছে গেল। পাছার

নিচে জুতোশুদ্ধ পা ভরে উল্টে দিল ওকে। তারপর থুথু ফেলল। রুমালে মুখ মুছে ওপরটা দেখে নিল। শুওরের বাচ্চা গুলি খেয়ে ওই ডালে উঠে বসেছিল। তারপর পড়ে গেছে। হুম্, গুলিটা পেটে লেগেছিল। চাপচাপ রক্ত প্যান্টে শার্টে, গাছের ডালে এবং মাটিতে। একমিনিট ভেবে নিয়ে শিস্ দিল সে।

একটু দূর থেকে সাড়া এল। দুবার শিস্। তারপর ফারুক এসে গেল।···মরে গেছে নাকি?

হুঁ। ফারু!

উঁ?

মাথাটা সাবড়াতে হবে। ড্যাগার লাগা।

মরে গেছে তো!

যা বলছি, কর্। সময় নেই।

পড়ে থাক্ না। শকুনে খেয়ে ফেলবে।

শালার যেমন বুদ্ধি! আবে বুদ্ধু কাঁহেকা—ইনদাটাকে চিনলে তুমিও গেছ। নে—হাত লাগা!···কী হল?

আমাদের মড়া কাটতে নেই! মাইরি পান্নাদা, পাপ হয়।

পাপ শুনে পান্না বোস হাসল।···ঠিক আছে, তুই টান করে ধর্—ড্যাগার দে। ইনদাটা ছেলে ভালই ছিল—এখন আর গাছপাথর ছাড়া কী! আমাদের ওসব ভাবতে নেই।

ব্রিজের মুখে নাজমা হঠাৎ দাঁড়াল।···সুশি, ওই ছেলেটাকে নিশ্চয় চেনেন না?

সুশি দেখে নিয়ে বলল, না। কিন্তু এখনও আপনিটাপনি করা হচ্ছে। আমি সমানে তুমি বলে যাচ্ছি।

নাজমা অপ্রস্তুত হাসল।···বলছি। ওই ছেলেটার নাম ফারুক। আমাদের গাঁয়ে বাড়ি। ভীষণ বদনাম আছে কিন্তু।

সুশি হেসে প্রশ্ন করল, কিসের বদনাম? প্রেম করে বেড়ায় বুঝি?

যাঃ! নাজমা ভ্রূ কুঁচকে ফারুককে দেখতে দেখতে বলল।— তা না। গুণ্ডামি করে বেড়ায়। পুলিশ কতবার ধরে নিয়ে গেছে। বাবার তদ্বিরে বেঁচে গেছে বরাবর। অথচ—জানেন, ষ্টুডেন্ট হিসেবে খুব ভালো ছিল। লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েছে। মাথার উপর কেউ নেই তো! তার ওপর ভীষণ গরীব।

সুশি বলল, আলাপ করিয়ে দাও না। ও ধরনের অনেক ছেলের সঙ্গে আমার চেনাজানা আছে। ওদের খুব ইন্টারেস্টিং লাগে কিন্তু।

নাজমা অবাক হল।...তাই বুঝি!

হ্যাঁ। ডাকো না ওকে।

না, না। জানতে পারলে বাবা বকবেন।

বাবা কি দেখছেন নাকি?

ফারুক ব্রীজের দিকে না এসে নদীতে নামছিল। নাজমা হাত নেড়ে ডাকল—ফারুদা, এই ফারুদা!

ফারুক সাড়া দিল। এখানে কি করছ নাজমা?

বেড়াচ্ছি। তুমি?

দোকান থেকে বাড়ি ফিরছি। কাজ আছে।

ফারুক এসে গেল।...ওঁকে চিনলুম না?

নাজমা মুখ টিপে হেসে সুশিকে দেখে নিয়ে বলল, দেবীকাকুর মেয়ে। বেড়াতে এসেছে।

ফারুক হাত জোড় করে বলল, নমস্কার।

সুশিও নমস্কার করল। · আপনি নাজমাদের গাঁয়ে থাকেন?

হ্যাঁ। ও পাঠশালা থেকে স্কুল অব্দি আমার সহপাঠিনী ছিল।

সুশি নাজমার দিকে ফিরে বলল সত্যি?

নাজমা ঘাড় নাড়ল। তারপর বলল, ফারুদা কাল রাত্রে এদিকে কী সব হাঙ্গামা হয়েছে গো?

ফারুক সিগ্রেট বের করে জ্বালল। ...কে জানে। আদার ব্যাপারি—জাহাজের খবর রাখিনে। আচ্ছা চলি।

সুশি গায়েপড়া হয়ে বলল, হেঁটে হেঁটে অতদূর যাবেন? নাজমা ওঁকে তোমার সাইকেলটা দাও না। বাবার জীপ এলে তোমাকে পৌঁছে দেব'খন।

নাজমা একটু বিরক্ত হল। কিন্তু কিছু বলল না।

ফারুক বলল, রক্ষে করুন। ও দেবী চৌধুরানী—ওর বাহনে চাপার ক্ষমতা কোথায় আমার? দেখলেন? দেখলেন কেমন গম্ভীর হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে?

ফারুক চলে গেল। সুশি বলল, ছেলেটি বেশ ভদ্র মনে হল কিন্তু। কিসের দোকান আছে ওর?

নাজমার গাম্ভীর্য কাটল না।·· সাইকেলটেল সারায় ষ্টেশন বাজারে। ·

আপনাকে কী বলল শুনলেন? দেবী চৌধুরানী! বাঃ, চমৎকার!

নাজমা একটু হাসবার চেষ্টা করে বলল, আমাদের পদবী চৌধুরী—তাই ও ঠাট্টা করে বলে কথাটা। করুক গে, আমি ভাবছি —কাল রাতের হাঙ্গামায় ও নির্ঘাৎ ছিল।

সুশি চমকাল হঠাৎ। হঠাৎ মনে পড়ে গেল সমুর কথা। সমু—সমুরও তো অমন বদনাম আছে! সমু কাল এখানে বেড়াতে এসেছিল! সুশি বলল, নাজমা—আপনি তো ষ্টেশনের ওদিকটা চেনেন?

হুঁ। ভালই চিনি। কেন?

রেলওয়ে ষ্টাফদের চেনেন?

না তো। কেউ চেনাজানা আছে নাকি?

আমার চেনাজানা একটি ছেলের সঙ্গে কাল বিকেলে এখানে দেখা হল। বলল, ওখানে কোন আত্মীয় বাড়ী এসেছে।

যাবেন? খুঁজে বের করে ফেলব। নাজমা উৎসাহ দেখাল।

...সরি, আবার আমরা আপনি বলছি। যাবে? তাহলে সাইকেলটা আনি—জাষ্ট এ মিনিট।

সুশি বলল, প্রথমপ্রথম এটা হবে। আপনি-টাপনির স্বভাবই এই।...সে হেসে উঠল সশব্দে। খুবই খুসির জোয়ার এসে গেল তার মনে। একটা বিহ্বলতা খেলা করতে থাকল তার চারপাশে। নিষিদ্ধ কোথাও পা বাড়ানো কিংবা অস্পৃশ্য কিছু ছুঁয়ে ফেলার মতো কিছু অস্বস্তিও অবশ্য সেই খুসি আর বিহ্বলতায় ছায়া ফেলছিল। সুশি মনে মনে নিজেকে বলল, আজ সারাদিন দুজনে টো টো করে ঘুরব বলেছি না? যা খুসি করব, যেখানে ইচ্ছে যাব। নাজমাকে এত ভাল লাগছে আমার।

চাপা গলায় ওরা কথা বলছিল। অনুরাধা আর নিরঞ্জন।

ন'টার লোকাল পাস করাবে। তাড়া ছিল নিরঞ্জনের। বড়বাবু শক্তিব্রত এখনও ঘুমুচ্ছে কিনা কে জানে। নিরঞ্জন স্নান করে কদাচিৎ। আজ স্নান করে ফেলেছে হঠাৎ। বলেছে, এমনি। কোন কারণ নেই।...

অনু বলল, কী ব্যাপার আমাকে জানাতে ভয় পাচ্ছ কেন? আমি কি পর?

নিরঞ্জনের মুখটা গম্ভীর। বিরক্ত। সে বলল, বারবার এককথা ভাল্লাগেনা। বললুম না, মাসতুতো ভাই। বুঝতেই তো পারছ, আজকালকার ছেলে সব—কোথায় বোমাফোমা বানাচ্ছিল। বার্ষ্ট করে পায়ে লেগেছে। তাই—

অনু কেমন হাসল।...শেষে তোমাকে আবার না জড়ায়।

কে?

পুলিশ। আবার কে?

পুলিশ এখানে আসবে না। যদি আসে, সে তোমার দায়িত্ব-হীন আচরনে।

অনু একটু দমে গিয়ে বলল, রেখারা আসবে। কী বলব তাদের ?

নিরঞ্জন একটুখানি ভেবে নিয়ে বলল, বলবে—বেড়াতে এসে অসুখে পড়েছে। তাছাড়া ওঘরে কাকেও নিয়ে যাবেই বা কেন ? আড্ডা দিতে হলে এঘরে দেবে।

অনু সামান্য চটল।···আমি বুঝি আড্ডাই দিই !

নিরঞ্জন কান করল না। রেল কোটটা গলিয়ে হেঁট হয়ে জুতো পরতে লাগল। এবং ফিতে বাঁধতে বাঁধতে মুখ তুলে বলল, সেই ভদ্রলোক—আমার বন্ধু—যদি আসে, কোন অযত্ন করোনা। আর ডাক্তার এলেও ম্যানেজ করে নিও। কেমন ?

অনু লক্ষ্মী মেয়ের মত ঘাড় নাড়ল।

গায়ে জ্বরটর আছে বোধ হয়। একটু লক্ষ্য রেখো। আমি খবর রাখবো। ভেবোনা।

অনু নাকের ডগা মুছে বলল, ভাববার কী আছে ? তুমি যাও। খেতে আসবে কখন ?

হ্যাঁ—আমি আজ বিশেষ আসব-টাসব না কোয়াটারে। খাবার পাঠিয়ে দিও সময় মতো। অনেক কাজ আছে···নিরঞ্জন একবার ভিতরে বেডরুমটা দেখবার মিথ্যে চেষ্টা করে পা বাড়াল।

অনু বলল, রাত্তিরেও আসা হবে না ?

তা কেন ?···বলে নিরঞ্জন হন হন করে চলে গেল।

অনু ছোট্ট উঠোনের প্রান্তে দরজাটা বন্ধ করে কয়েকমুহূর্ত বারান্দার ধাপে দাঁড়িয়ে রইল। বুকে হাতুড়ির শব্দ হচ্ছিল।

তারপর ঘরে ঢুকল সে। তারপর বেডরুমের পর্দা সরিয়ে উঁকি দিল। সবগুলো জানালা বন্ধ। আবছা অন্ধকারে শুয়ে আছে চিত হয়ে—মুখটা অসম্ভব সাদা দেখাচ্ছে। এক চিলতে গোঁফের নিচে শুকনো দুটো ঠোঁট একটু কাঁপছে। গলা অব্দি চাদর ঢাকা। একটা পায়ের নিচে বালিশ। অনু নিষ্পলক তাকিয়ে রইল। মমতা করবে, নাকি ঘেন্না ? করুণা, নাকি ভয় ?. সত্যি সত্যি বোমা

বানাচ্ছিল? ছোটবাবু, তোমার ও ছেঁদো চালাকিতে কাজ হবে না। কাল রাত্তিরে···

মুহুর্মুহু গা শিউরে উঠতে লাগল অনুর। নিরঞ্জন মানুষটা আসলে কি?···

বউদি!

পলকে রক্ত ছলকে চলে গেছে দেহের একোণা থেকে ওকোনায়। অনু বিড়বিড় করে বলল, এই যে—আছি ভাই। বলুন।

কাছে আসুন না—ভয় করছেন কেন?

অনু কাঁচুমাচু মুখে পা বাড়িয়ে বলল, না—না ভয় কিসের? শরীর খারাপ করছেনা তো? ডাক্তার এসে পড়বে এক্ষুনি।

নাঃ, আপনার মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে, আপনি নার্ভাস হয়ে পড়েছেন।

অনু অতিরিক্ত সাহসী হয়ে পড়ল হঠাৎ। একেবারে খাটে গিয়ে বসল—বলল, যাঃ! আপনার নামটা কী যেন ভাই?

সমীর। বউদি আপনি কোথাকার মেয়ে?

চুঁচড়োর। কেন ভাই?

এমনি।

বউদি, আমার পাটা সরিয়ে অন্য জায়গায় দিন না।

অনু সাবধানে পায়ের নিচের বালিশ সরিয়ে তারপর পাটা তুলল।

ইস্, কী পাপ না হচ্ছে আমার! বউদিকে পায়ে হাত দেওয়াচ্ছি!

অনু হাসল। খুব হয়েছে! এখন যন্ত্রণা হচ্ছে না তো?

কে জানে শা—(জিভ কেটে)···বউদি তোমার নামটা বলবে?

অনুরাধা—অনুরাধা মৈত্র।···

বাইরে রেখা ডাকাডাকি করছিল। সদর দরজায় জোর

ধাক্কাধাক্কি—অনু কাঠ হয়ে থাকল। তারপর একেবারে জানালায় ধাক্কা এবং চেঁচামেচি। অনু দৌড়ে পাশের ঘরে গেল।

জানালা খুলে বলল, কী হয়েছে রেখা?

রেখা দৌড়ে এল।·· দরজা জানালা বন্ধ করে এখনও ঘুমোচ্ছেন? বাব্বা, কী মানুষ!

অনু ঠোঁট কামড়ে বলল, শরীর খারাপ ভাই। কিছু বলবে?

রেখা জানালার রড ধরে চাপাগলায় বলল, কোত্থেকে কারা সব এসেছে। একজনকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। কোয়াটারেই নাকি আছে—

অনুর চোখ সাদা হয়ে উঠল। রুদ্ধশ্বাসে সে বলল, পুলিশ?

ফিক করে হেসে রড ছেড়ে দিল রেখা।···যাঃ! পুলিশ টুলিশ না। কী সব বলেন আজেবাজে! ওই ওদিকে দাঁড়িয়ে আছে।

অনু জানালায় নাক রেখে দেখবার চেষ্টা করে বলল, কে?

আপনাদের কেউ মাসতুতো পিসতুতো ভাইটাই এসেছে?

না। কেন?

পরক্ষণে অনু অবাক হয়ে দেখল, দুটি মেয়ে ওদিক থেকে এসে হাজির হল রেখার পাশে। একজন শাড়ি, অন্যজন শালোয়ার। শাড়ি হাত তুলে বলল, নমস্কার।

অনুও নমস্কার করল—খানিকটা।

আচ্ছা, দেখুন—আমরা একজনকে খুঁজছি। আমার চেনাজানা ছেলে—ডাকনাম সমু—কলকাতা থেকে মাসতুতো দাদার বাড়ি এসেছে এখানে। রেলষ্টাফের মধ্যেই···

অনু চোখ বুজে বলে দিল, না—তেমন তো কেউ ··

পাশের ঘর থেকে একটু চড়া গলায় ডাক এল, বউদি, ওকে আসতে বলুন। আমাকেই খুঁজছে।

অনু অপ্রস্তুত। তিনটি মেয়েই অবশ্য একসঙ্গে খিলখিল করে হেসে উঠেছে।

অনু ভুরু কুঁচকে শুধু বলল, আসুন।

বসবার ঘর থেকে দুটো মোড়া আনা হল অবশ্য। নাজমা বসল একটাতে—অন্যটায় কেউ বসল না। রেখা—বড়বাবুর ফ্রকপরা মেয়ে—সে জানালায় অশ্লীল ভাবে বসল, একটা পা তুলে, অন্যটা মেঝেয় নামিয়ে এবং ওর অস্বাভাবিক ছোট্ট জাঙিয়াটা দেখা যাচ্ছিল। অনু দাঁড়িয়ে রইল। সুশি বিছানায় বসে পড়েছে নিঃসংকোচে। মাথার কাছের জানালাটা খুলে দিয়েছে নিজের হাতে।

সমু একটু-একটু হাসছিল। তার কী? পান্না বোস শুনেটুনে ক্ষেপে যাবে। কিন্তু সেও তো দিব্যি ঝুক্কিটা নিয়ে ফেলেছে! ফারুক বলেছিল তার গাঁয়ে নিয়ে যেতে। পান্নাদার মতে—সেইটেই নাকি বড্ড সাংঘাতিক হত! তার চেয়ে নাকের ডগায় কিছুটা সময় থেকে যাক্। শিগগির ব্যবস্থা করে কলকাতা নিয়ে যাবে। তখন আর কোন ঝামেলা নেই। আর, এ ছোটবাবুটি পান্নাদার হাতের লোক—ছেলেবেলার বন্ধুও। সমু টের পেয়েছে, লোকটা ঘড়েল মাল—অগাধ জলের মাছ। শুধু খারাপ লাগে, শুত্তরের বাচ্চার কপালটা কী! না—চেহারা বা স্বাস্থ্যের কথা নয়; মন। এত ভালো মন আজকাল কটা মেয়ের আছে?

সুশি বলল, এসেই জ্বর বাধিয়েছ! আর বুঝি সময় ছিল না?

সমু বলল, ওবেলা ছেড়ে যাবে। ভেবো না।

সুশির মুখটা রাঙা হয়ে উঠল।...আমি ভাবব? যাঃ! কেন? এই নাজমা, এস আলাপ করিয়ে দিই।...

নাজমা এবং সমু পরস্পর নমস্কার করল। নাজমা বলল, ভীষণ খুঁজে বের করেছি আপনাকে।

সমু বলল, গরুখোঁজা!

অনু বাদে সবাই হেসে উঠল। অনু হঠাৎ বেরিয়ে গেল। তাকে অনুসরণ করল রেখা। সুশি বলল, দেখুন বউদি—বউদিই বলছি, চা ফা করবেন না যেন।

অনু পিছুফিরে হাসল।...তা কী হয়! বসুন। আসছি।

সমু চাপা গলায় বলল, আমার বউদিটি খুব অতিথি পরায়না। তা সুশি, সিংহ দেখা হয়েছে?

সুশি অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল হঠাৎ। চমকে উঠে বলল, ম্লাঃ।

আমার দেখা হয়ে গেছে। অনেকবার।...বলে সমু খুব সাবধানে বালিশের নিচেটা হাতড়ে সিগ্রেটের প্যাকেট বের করল। সিগ্রেট বের করতে গিয়ে দেখল আঙ্গুলে বড্ড ব্যথা। কী সব রিভলভার এসেছে—ট্রিগারগুলো ভয়ানক বেয়াদপি করে। পান্নাদা হাতে রুমাল জড়াতে বলেছিল—মনে ছিল না। সে বলল, সুশি, সিগ্রেটটা—কিছু মনে করোনা কিন্তু—(নাজমাকে) আপনিও না প্লাজ...

সুশি আড়ষ্টহাতে সিগ্রেটটা ওর ঠোঁটে দিল এবং দেশলাই জ্বালাবার ব্যর্থ চেষ্টা করছিল। তখন নাজমা উঠে গিয়ে জ্বেলে দিল এবং ধরিয়ে দিলও। সমু চোখ বুজে টান দিচ্ছিল।...শালা আজ আমার কপাল। পান্নাদার হিংসে হবে। সে চোখ খুলে ধুঁয়োর রিঙ পাকিয়ে নাজমার উদ্দেশ্যে বলল, আপনি কোথায় থাকেন?

নাজমা বলল, পায়রাডাঙায়। চেনেন?

নাঃ। এদিকে কখনও আসিনি।

অসুখ সারলে সুখেতার সঙ্গে যাবেন কিন্তু।

যাবো।

সুশি বলল, সমুদা, নাজমা জব্বর খেলোয়াড়। ডিস্ট্রিক্ট চ্যাম্পিয়ান, আবার বন্দুক ছুঁড়তেও পারে। তোমাকেও...হঠাৎ থেমে গেল সুশি।

সমু বলল, থামলে কেন? আমাকেও হারাতে পারে—এই তো? হারাক না। আমি তো কখনো ডুয়েল লড়তে যাচ্ছিনে ওঁর সঙ্গে।

নাজমা সোৎসাহে বলল, আপনিও বন্দুক চালান, তাই না?

জবাবটা সুশি দিল।...ওয়েষ্টার্ন ফিল্ম দেখেছো তো? জাস্ট

লাইক এ মেকসিকান কাউবয়। ও জব্বর স্ট্রীট ফাইটার। সব্যসাচী রীতিমতো।

সুশি সকৌতুকে খোলাখুলি বলে যাচ্ছিল। সমু বলল, সেই-জন্যেই সুশির চোখে আমি হিরো। জানেন?

সুশি জোরে হেসে উঠল। নাজমা মন্তব্য করল—আজকালকার ছেলেরা ওইরকম। কত কী পারে!

অনু আর রেখা এল। ট্রে ভরতি জলের গ্লাস, প্লেটে সন্দেশ। কোণের টেবিলটা টেনে ট্রে রাখল। তারপর হাসিমুখে ফের চলে গেল। সম্ভবত চায়ের জল চাপিয়ে এসেছে। রেখা বলল, কই খেয়ে নিন।

সুশি ওকে তীক্ষ্ণদৃষ্টে লক্ষ্য করছিল। আপনি বলবে—না তুমি—ঠিক করতে পারছিল না। মেঘে মেঘে বেলা বেড়েছে। পুষ্ট বুকের ব্যাপারটা ফ্রকে ঢাকা কঠিন আছে। ওই বয়স কিছুকাল আগে সুশি পেরিয়েছে। ইস্, কী দিন ছিল সব! জানা-অজানার সেই সীমান্তে মেয়েরা পায়ে পায়ে ঠকে আর বোকা বনে যায়। যাই হোক, এখন তার চালাক হবার দিন। এখন বুদ্ধির আলো চারপাশে ঝলমল করছে। সুশি বলল, তোমার নামটি কী ভাই?

রেখা—রেখা মিত্তির।

কোন ক্লাসে পড়ো?

টেন।

কো-এডুকেশান?

...প্রশ্নটা সুশি নাজমার দিকে তাকিয়েই করল। তাই নাজমাই জবাব দিল, হ্যাঁ। মৌরীগ্রামে স্কুল-কলেজ তো একটা-একটা। সবই কো-এডুকেশান। তবে আলাদা গার্লস কলেজের চেষ্টা হচ্ছে। বাবা খুবই চেষ্টা করছেন।...

স্কুলকলেজ এবং স্থানীয় সমস্যা নিয়ে কিছুক্ষণ মেতে গেল ওরা। অনু কখন এসে একটা মোড়ায় বসে পড়েছে। নিঃশব্দে শুনছে। মাঝে মাঝে সে ডাক্তারবাবুর কথা ভাবছে। এতক্ষণ অবশ্যই

আসা উচিত ছিল। দেরী হচ্ছে কেন? এলে এদের সে পাশের ঘরে নিয়ে যাবে।

সমু চোখ বুজেছে কতক্ষণ। ওর চোয়াল আঁটো দেখাচ্ছে। এবং সুশি হঠাৎ চমকে উঠল।...সমুদা, রক্ত! তোমার পায়ে রক্ত! ইস্!

ঘরশুদ্ধ চমকে উঠে চোখ রেখেছে পায়ের দিকে। চাদর ছাপিয়ে একচাপ টাটকা রক্ত ফুঠেছে। অনু উঠে দাঁড়াল। ঠোঁট কামড়ে বলল, আপনারা একটু পাশের ঘরে গিয়ে বসবেন?

তিনটি অবাক মেয়ে নিঃশব্দে পাশের ঘরে চলে গেল সঙ্গে সঙ্গে। ট্রেতে অভুক্ত খাবার।

অনু একটু ঝুঁকে ডাকল, এই, শুনছেন?

সমু সম্ভবত অজ্ঞান হয়ে গেছে। রাগেদুঃখে অনুর চোখে জল এসে গেল।...

রেখার মুখে খবর পেয়ে নিরঞ্জন এল হন্তদন্ত। এসেই তার মুখে কথা সরে না কয়েকমুহূর্ত। তিনতিনটি বহিরাগত—এবং মেয়ে। সর্বনাশ হয়ে যাবে! সে অপ্রস্তুত হেসে বলল, আরে কী কাণ্ড! বেচারা সদ্য কাল এসেছে বেড়াতে। তারপর রাত্তিরে ওই হাঙ্গামা। ওভারব্রীজে দাঁড়িয়ে বাবু মজা দেখতে গিয়েছিলেন। গুলিগোলার আওয়াজে ভয় পেয়ে—একেবারে ছেলেমানুষ, তার ওপর ভীতুর রাজা, দিল লাফ লাইনের ওপর। ব্যস! সাংঘাতিক জখম সঙ্গে সঙ্গে!...

রেখা বলল, দাদা, ডাক্তারকে খবর দিন। খুব রক্ত যে!

দিচ্ছি, দিচ্ছি!...নিরঞ্জন অনুর দিকে কেমন ঠাণ্ডা চোখে তাকিয়ে বলল, আমাদের একটা ফার্স্ট-এডের বাক্স ছিল না? কোথায় সেটা?

অনু খুঁজতে গেল ওঘরে।

নিরঞ্জন সুশির দিকে তাকাল।···আপনারা কোত্থেকে? চিনতে পারছিনে তো?

রেখা বলে দিল।···ওদিকে কোথায় ফার্ম আছে না? সেখানকার। আর উনি পায়রাডাঙার। তোমার ভায়ের সঙ্গে চেনাজানা আছে।

সুশি বলল, আমার বাবার নাম দেবী ব্যানারজি। চিনবেন সম্ভবত। গতবার ইলেকশানে দাঁড়িয়েছিলেন।

নিরঞ্জন বলল, আরে, কী মুসকিল! দেবীদার মেয়ে! দেবীদা কেমন? ভালো তো? সমীরের সঙ্গে চেনা আছে? বাঃ!

সুশি বলল, ওকে তো সৌমেন নামে জানি। ওর আসল নাম সমীর নাকি? যা বাব্বা! আমরা তো সমুদা বলি।

নিরঞ্জন বলল, আর ইনি?

নাজমা জানাল।···আমি পায়রাডাঙার হাতেম চৌধুরীর মেয়ে।

নিরঞ্জন ব্যস্ত হয়ে বলল, কী কাণ্ড! বড়বড় কুটুম্ব ঘরে এসে বসে রয়েছে, এদিকে আমি টরে-টক্কা করছি। রেখা, এঁদের নিয়ে ঘুরেফিরে সব দেখাটেখা!

রেখা বলল, এখানে আবার দেখবার কী আছে?

নিরঞ্জন বলল, কেন? সাধুবাবার আখড়া আর গির্জে! যান, ঘুরে দেখে আসুন। (নাজমাকে) আপনি অবশ্যি লোকাল—সবই চেনেন। অনু, পেলে বাকসো?

সুশি বিরক্ত হয়ে পা বাড়াল প্রথমে। নাজমা আর রেখা চোখ টেপাটিপি করে একটু হাসল। বাইরে এসে রেখা বলল, চলুন না দিদি, আমাদের বাসায়। কেউ নেই—একাএকা থাকি।···

॥ তিন ॥

বড়বাবু শক্তিব্রত ঝিমোচ্ছিলেন। লুপ লাইনের কারবার। ট্রেন চলাচল এমনিতে কম, তার ওপর আজকাল এখানে ওখানে হাঙ্গামা। কোথায় চেন টানছে, কোথায় চোরাকারবারীদের সাথে যাত্রীদের সংঘর্ষ, চলন্ত গাড়িতে ডাকাতি আর ছিনতাই, ওদিকে আপে একজায়গায় হল্ট ষ্টেশনের দাবীতে প্রায়ই লোকেরা এসে লাইন অবরোধ করে বসে থাকছে।···কী রকম গণ্ডগুলে যুগ পড়েছে মশাই।···একটু আগে এক যাত্রীকে বলছিলেন শক্তিব্রত।···বাইশ বছর ধরে আগুন ধোঁয়াচ্ছে কেবল। তবে এবার ক্রমশ ধোঁয়াটা বেশি। আগুনও দেখা দিয়েছে। দেখবেন, সব জ্বলেপুড়ে ছাই হয়ে যাবে। যাক্! যাওয়াই ভাল। কী বলেন?

যাত্রী ভদ্রলোক বউ-ছেলে নিয়ে ট্রেনের অপেক্ষায় বসে আছেন। তাঁর মনটা ঘড়ির কাঁটায় বাঁধা। তেমন কান করলেন না। শুধু মাথা নেড়ে মৃদুমৃদু হাস্য।

শক্তিব্রত মনে মনে গাল দিচ্ছিলেন, শালা কুকুর যতসব! ডাষ্টবিনে বিয়োচ্ছে আর একহাত জিভ বের করে ঘুরছে। বোঝা যায়, জাঁদরেল চাকুরে। ভাল পায়-টায়। পৃথিবী গোল্লায় যাক্, তোমার কী বাবা! মাসের শেষে হাত বাড়ালেই তঙ্কাটি পাচ্ছ। তারপর বউর কাপড়চোপড় কেনো। ফুর্তি ওড়াও!

দুপুরের দিক ডাউনে বেশ ভিড় হয়। কলকাতার যাত্রীই খা[illegible]শ। একজন দুজন করে ইতিমধ্যে আসা সুরু হয়েছে। উদাস রা[illegible]খে একবার তাকিয়ে হাই তুললেন শক্তিব্রত। এক কোণে বসে [illegible]ত্রিকা পড়ছে টি. সি. মনমোহন। এখানেই সে গাড়ি বদলায় আপ থেকে ডাউন, ডাউন থেকে আপে। শক্তিব্রত মনেমনে তাকেও [illegible]ার কতক কুকুর বলে গাল দিলেন। তারপর ডাকলেন, মনো?

বলুন দাদা।···মনমোহন পত্রিকায় চোখ রেখে বলল।

একটু ঝুঁকে চাপা গলায় শক্তিব্রত বললেন, কালকের কাণ্ড।

হুঁ।

হিকির গ্যাঙের। বুঝলে?

উঁ?

হিকির নাম শোননি? আসানসোল-পাটনার মধ্যে বদমাইসি করে বেড়ায়। কী হে তুমি।

হ্যাঁ—তা কী হল?···মনমোহন এখনও পত্রিকায় বাঁধা পড়ে আছে।

শক্তিব্রত কণ্ঠস্বর আরও চাপা করলেন, বুঝলে মনো? কাল তিনটের আগে এক ব্যাটা সায়েব নেমেছিল, হঠাৎ এখন খেয়াল হল। ভাবলাম, ট্যুরিষ্ট হবেটবে। আরমানি গির্জে দেখতে যাচ্ছে। কত সময় তো আসে। আসে না?

বলেন কী! মনমোহন এবার মুখ তুলল।

কথাটা ইমপরট্যান্ট। জানিয়ে দেওয়া দরকার। কী বলো?

নিশ্চয়।

আর—মাইরি মনো, এখানটায় ওয়াগনব্রেকিং তো বছরে চৌদ্দবার হচ্ছে, তবু ভালমত গার্ড দেওয়া কিছুতেই হবে না। সেই দুজন মাত্তর নিধিরাম সর্দার। তার ওপর পিঠের কাছে ওই জঙ্গলটা। ইয়ার্ড হটিয়ে জংশনে নিয়ে যাক্ না। কে শোনে কার কথা।

মনমোহন পত্রিকায় ঝাঁপ দেবার আগে বলে গেল, ছেড়ে দিন।

মনমরা হয়ে গেলেন শক্তিব্রত। সবাই কেমন যেন উদাস হয়ে পড়ছে। নির্বিকার হয়ে যাচ্ছে। কোন রকম বিস্ময় নেই, [illegible] নেই, প্রতিবাদ নেই। কী দ্রুত সব বদলে গেল চোখের সাম[illegible] একদল বদমাইস যা খুসি করে যাবে, তাকিয়ে তাকিয়ে দেখ[illegible] গাড়ির ফ্যান খুলবে, বাল্‌ব্ নেবে, গদী ওপড়াবে, তার কাটবে, কেউ টুঁ শব্দটি করবে না। কিন্তু তার দরুণ, যেই না গাড়ি [illegible]

হল, অমনি সবার শরীর থেকে বিশখানা হাত গজিয়ে দে মার—ড্রাইভার, গার্ড, ষ্টেশন মাষ্টার, যাকে পাবে, রক্ষে নেই। ধুস্ শালা! ঘেন্না ধরে গেল।

আরে, দেখছ কাণ্ড? শক্তিব্রত লাফিয়ে উঠলেন···নিরঞ্জন এখনও ফিরল না!

মনমোহন হাসল।···নতুন বউ। একটু জমাতে দিন না দাদা। ফ্যাকড়া দিচ্ছেন কেন?

শক্তিব্রতও হেসে ফেললেন।···মাইরি, নিরঞ্জনটা বেলা গড়িয়ে বে করে একেবারে স্ট্রেন হয়ে গেছে। ডিউটি ফেল করে···দেখ হে মনো, বিয়ে আমিও করেছিলাম। না, করিনি? তাবলে—এতখানি ভাল নয়। ওতে মেয়েমানুষ লাই পায়। আর, কী ধুন্ধুমার কাণ্ড চলছে (চাপা স্বরে) তুমি অবাক হয়ে যাবে মনো। যখনই বাসায় যাই, দেখি—ওঁর বউ জানালার ধারে বসে আছে গোমড়ামুখে। আমার মেয়েটা সব জানেটানে তো। বলে, ওদের মধ্যে একেবারে বনিবনা নেই। শুধু ঝগড়া আর ঝগড়া···ছ্যাঃ!

টেলিগ্রাফ বাজতে লাগল। শক্তিব্রত ঘুরে বসলেন চকিতে।

কিছুক্ষণ পরে এদিকে মুখ ফেরালেন। বললেন, এইটিন ডাউন অনিশ্চিত সময়ের জন্যে লেট। চিরুটির কাছে কারা ফিসপ্লেট খুলে রেখেছিল। মালগাড়ি উল্টেছে। নাও, এখন ভেরেণ্ডা ভাজো। হ্যাঃ হ্যাঃ হ্যাঃ।

উঠে দাঁড়ালেন শক্তিব্রত। দেখলেন, মনমোহন হাঁ করে তাকিয়ে আছে তাঁর দিকে।···তাহলে এবেলা আমার এখানেই দুপুরের খাওয়াটা সেরে নাও হে। রেখাকে খবর দিই। রামশরণ, এ রামশরণ!

মনমোহন বলল, না, না। আর ও বেচারাকে কষ্ট দেবেন না দাদা। আমি বরং হোটেলেই খেয়ে নেব'খন।

শক্তিব্রত মাথা নাড়লেন।···আরে, রেখাকে তুমি জানোনা। কোন অসুবিধে হবে না। বরং আমি কী আনন্দ যে পাবো, ভাবতেই

পারো না। মনো, পাঁচ বছর আগে আমার একটা বড় সংসার ছিল—তুমি তো জানো। তিন ছেলে দুই মেয়ে, স্ত্রী—একসঙ্গে সব খেতে বসতাম। আমি ভাই বরাবর একটু হুল্লোড়ে মানুষ। বিশেষ করে, খেতে বসলে তো কথাই নেই। লোকে সব শুনেটুনে বলত, ওই, বড়বাবুরা খেতে বসেছে! তা শালার ইয়ে···

হঠাৎ পায়ে চটি গলিয়ে শক্তিব্রত হন হন করে বেরিয়ে গেলেন। মনমোহন টের পেল, চোখে জল এসে গিয়েছিল বড়বাবুর। আহা, বদমাইস ডাকাতগুলো একরাত্রে ওঁর সংসারটা শ্মশান করে গিয়েছিল। কোলের ছেলেটিকেও রেহাই দ্যায়নি। রেখা—একমাত্র রেখাই কীভাবে বেঁচে গিয়েছিল কে জানে। বড়বাবু তখন ষ্টেশনে—রাতটা ছিল দুর্যোগের। দুর্বৃত্তরা কোয়াটারে নৃশংস হত্যাকাণ্ড করে যখন দেখল, সব ব্যর্থ—কোন লাভ হল না, ষ্টেশনে ধাওয়া করেছিল। বড়বাবু টের পেয়ে ঝড়জলের মধ্যে পালিয়ে গা ঢাকা দিয়েছিলেন আগাছার ঝোপে।

সেটা ঘটেছিল বর্ধমান লাইনের একটা ছোট্ট ষ্টেশনে। বড়বাবু কিছু লটারির টাকা পেয়েছিলেন। সেই হল ডাকাতির কারণ। নির্বোধ ডাকাতগুলোর বোঝা উচিত ছিল, অত টাকা কেউ ঘরে রাখে না!

পরে টাকাটা স্ত্রীপুত্রদের আত্মার মঙ্গলের জন্য পুরো দান করে ফেলেছিলেন শক্তিব্রত।···

কিন্তু আসল কথাটা এই: সবাই একটা করে ফুটো ফুসফুস বয়ে বেড়াচ্ছে—বাইরে বাইরে কিচ্ছু বোঝা যায় না।

মনমোহনের মনটা খারাপ হয়ে গেল। আইন নিরাপত্তা দিতে পারে না। মানুষই মানুষের নিরাপত্তার জিম্মাদার। সত্যি, মানুষ কথাটাই কেমন অর্থহীন লাগে! মনমোহন এক সময় মিলিটারিতে ছিল। ছাঁটাই হবার পর রেলদপ্তরে ফের চাকরী পেয়েছে। মনমোহন যখন মানুষ কথাটা নিয়ে ভাবে, তখন তার মিলিটারি জীবনের ছকে ফেলেই ভাবে। যুদ্ধ—যুদ্ধই তো মানুষকে ভালো

করে চিনিয়ে দ্যায়। কত সহজে সাজানো পৃথিবী মিথ্যে হয়ে পড়ে তখন!···মনমোহন আঙুল দিয়ে পত্রিকার প্রচ্ছদে মানুষ লিখে ফের তার ওপর একটা অশ্লীল শব্দ লিখল। কেমন হাসল।

দরজায় উঁকি মেরে কে একজন বলল, দাদু, ট্রেন লেট নেই তো?

আছে।

কতক্ষণ দাদু?

জানিনে।

কী জানেন? লাইন উল্টে দিতে বলুন। আর কেন

মনমোহন হো হো করে হেসে উঠল।

আবার হাসি হচ্ছে! খোকন, রেলবাবুরা হাসছে দেখে যা।

মুখ ভেংচে চলে গেল কজন কমবয়সী যাত্রী। প্যান্টসার্ট ছুঁচলো জুতো, ঝাকড়মাকড় চুল। সবখানে এই রকমসকম। দেখলেই মনে হয়, একেকখানা ধারাল ছুরি—যা একমাত্র কাটাকুটির কাজেই লাগে। মনমোহন তবু হাসতে লাগল।

কতক্ষণ পরে সত্যিসত্যি খাওয়ার ডাক এল। মনমোহনের এ নিয়ে তিনবার। মুখে সে না-না ইত্যাদি বলে, কিন্তু ভিতরটা চাপা উত্তেজনায় গরগর করতে থাকে—মনমোহন দেখেছে, এই ভাবটা একটুও তার শাসনের তোয়াক্কা করে না। বড়বাবুর বাড়ি যাওয়া—তার মানে, রেখার সঙ্গে কথা বলার ব্যাপার—সেটা তার কাছে কেমন যেন অস্বাভাবিক ঘটনার মতো। তার খালি মনে হয়, এটা ঠিক হচ্ছে না—মোটেও ঠিক হচ্ছে না। তার কানের পাশের কিছু চুল পাকতে সুরু করেছে এবং ভিতরে ভিতরে তার বয়স চল্লিশ হয়ে এল। বিয়ে করলে এ্যাদ্দিনে তার রেখার মতো একটি মেয়ে জন্মাতেও বাধা ছিল না। তাছাড়া, রেখার জীবনটাই এ পৃথিবীর এক নৃশংসতম পরিচয়ের স্মৃতিচিহ্ন বহন করছে। ওকে দেখলেই

তার মানুষকে ঘেন্না করতে ইচ্ছে করে। বিস্বাদ হয়ে ওঠে সব সহজ সুখে ভরা এইসব মানুষজনের পৃথিবী। অথচ…

অথচ ব্যাপারটা ঠিক এরকম। মনমোহন একবার একটা কাণ্ড দেখেছিল। রেললাইনের পাশের ঝোপজঙ্গলগুলো রেলের লোকেরা পুড়িয়ে দিয়েছিল একজায়গায়। সেখানে সাদা-সাদা কী সব ফুল ফুটত। সে তারিফ করেছে ফুলগুলোর। তা, অদ্ভুত দৃশ্য—ছাইগাদার ওপর পরদিন সকালে এক ঝাঁক প্রজাপতি ঘুরঘুর করছে। কয়েকটা বসে পড়েছেও পোড়া ডালপালায়। কী খারাপ না লাগছিল! এখনও আশা?

অভ্যাস! এবং নির্বোধ অভ্যাস।

রেখাকে ভাবলেই দৃশ্যটা তার মনে পড়ে। রেখার জন্যে বুক টনটন করে তার। কিন্তু মানুষের রক্তের কাণ্ডকারখানা কী রকম যেন। রেখার সান্নিধ্য তার ইচ্ছা অনিচ্ছার বাইরে থেকে একটা চরম ধরণের নিষিদ্ধ আনন্দ দ্যায়।

সে কি রেখারই দায়িত্ব পুরোটাই? মনমোহন তাই ভাবে। রেখার সেক্‌সি গড়ন, তার দৃষ্টি, তার কণ্ঠস্বর—মানুষকে পাপের দিকে পলকে পলকে ঠেলে দিতে পারে। কিছুতেই নিজেকে রক্ষা করতে পারে না মনমোহন। যত দোষ সবই ওই কিশোরী মেয়েটির। ডাকাতগুলোর অত দূরদৃষ্টি ছিল না।

সকালে এসেই এক বাকসো চকোলেট দিয়ে পাঠিয়েছে অভ্যাস-মতো। নিজের হাতে দিতে যেত—নিরঞ্জন একটা কাজে আটকাল। লেজারের আকজোঁকে জড়িয়ে ফেলল ওকে। মনমোহন আশা করেছিল, রেখা অন্তত একবার দেখা দিয়ে যাবে। আসছিল না তো। বারবার মুখ ফিরিয়ে দেখছিল দরজার দিকে। অবশেষে যদি বা এল, টিকেট কাটবার জানালার ওদিক থেকে নিরঞ্জনকে ডেকে কী খবর দিয়ে গেল চাপা গলায়। দেখেও দেখল না মনমোহনকে। রেখা কি সত্যি অকৃতজ্ঞ চরিত্রের মেয়ে? মনমোহন ভাবছিল। নিরঞ্জন ব্যস্তভাবে বলল, আসছি।

মুখ তুলে মনমোহন বলেছিল, কী ব্যাপার? কার অসুখ বেড়েছে হে? বউর নাকি?

কেমন হাসছিল নিরঞ্জন।···আর বোলো না ভাই। ইয়ের—আচ্ছা, এক্ষুণি আসছি। তুমি টোটাল মিলিয়ে-মিলিয়ে গ্র্যাণ্ডটোটালগুলো সেরে ফেলো।···খুব তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গিয়েছিল সে।

শক্তিব্রত নিবিষ্টমনে টেলিগ্রাম করছিলেন। লক্ষ্যও করেন নি সম্ভবত। কতক্ষণ পরে ঘাড় ঘুরিয়ে এদিকওদিক দেখে ফিক করে হেসেছিলেন মাত্র। কেন হেসেছিলেন, এখন অবশ্য টের পাচ্ছে মনমোহন। নিরঞ্জন আর তার বউকে ভেবেই হেসেছিলেন।

রেখা কাজের মেয়ে হিসেবেও চমৎকার। রাঁধবার লোক রাখতে ছায়নি বাবাকে। তা মন্দ রাঁধে না। সেদিক থেকে একেবারে দারুণ গিন্নী। ঝকঝকে ঘরদোর, পরিপাটি সাজানো ঘরকন্না। স্কুল করেও এত সব পারে সে। ঝি একজন আছে। সে সব সময় ধমক খায়। তার হাতের কাজ কেড়ে নিয়ে রেখাই সব করেটরে। এতে ঝিয়ের বেশ মজা হয়েছে। ইচ্ছে করেই ফাঁকি ছায়—বাসনের গায়ে এঁটো লাগিয়ে রাখে, নয়তো ধুলোময়লা কোথাও আস্ত রেখেই ঝাড়ু চালায়। তখন রেখা নির্ঘাৎ হা লাগাবে এবং সে বসে আরাম খাবে।··· য়

মাছের ঝোল, একটা তরকারি, ভাজাভুজি, ডাল—খাওয়াটা বেশ হল। দই এল, কিছু মিষ্টিও। শক্তিব্রতর মন পড়ে আছে ষ্টেশনে—আঁচিয়েই ছুটলেন। বলে গেলেন, মনো—নাক ডাকিয়ে ঘুমোও। দেখি—ট্রলিফলি বা মালগাড়ি এসে গেলে খবর দেব। ভেবো না।

মনমোহন সিগ্রেট ধরিয়ে বলল, ঠিক আছে। পেটে কিছু পড়লে আমার বড্ড বদ অভ্যাস—হেঁঃ হেঁঃ হেঁঃ!

বিছানাটা ঝেড়ে দিয়ে রেখা বলল, খবর্দার—যেখানে সেখানে ছাই ফেলবেন না। একটা কাপ এনে দিচ্ছি।

মনমোহন পা ছড়িয়ে শুল। বলল, রেখা, তুমি খাবে কখন?

রেখা হিসেব করার ভঙ্গীতে বলল, খাচ্ছি'খন। কেন? এক্ষুণি একবার বউদির ঘরে যাব, ওঁর দেওরের পায়ে রক্ত পড়ছিল—বন্ধ হল নাকি দেখব, তারপর ফিরে এসে চান করব, তারপর···

মনমোহন থামিয়ে দিল।···দেওরের পায়ে রক্ত পড়ছিল! কার দেওর?

আবার কার? বউদির। কাল বিকেলে বেড়াতে এসেছেন। কলকাতায় থাকেন। কী আনাড়ি আর ভীতু ছেলে রে বাবা!··· রেখা হেসে উঠল।···রাত্তিরে বোমাবাজি হচ্ছিল না? তখন বাবু ওভারব্রীজে গিয়ে মজা দেখছিলেন। তারপর এদিকে বোমা ফাটাফাটি যেই না লাগা, তাড়াহুড়ো নামতে গিয়ে একেবারে পড়লেন লাইনের ওপর!···

মনমোহন হাসতে গিয়ে পারল না। ধোঁয়া আটকে কাসি এল।

রেখা চুলের ক্লিপ খুলে আঁচড়াতে সুরু করল। ড্রেসিং টেবিলের মেভিতর প্রতিবিম্বিত মনমোহনের দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে সে ফর বলল, ছেলেটা নির্ঘাৎ প্রেম করে, বুঝলেন মনোদা?

মনমোহন নার্ভাস হেসে বলল, তুমিও মনোদা বলছ, তোমার বে ইয়েও—যাক্‌গে। প্রেম করে মানে?

দ্রুত চুল আঁচড়ে নিচ্ছিল রেখা। বলল, মাথায় টনক নড়েছিল ওর গার্লফ্রেণ্ডের। বাব্বা! কোত্থেকে খবর পায় সব? ঠিক খুঁজে খুঁজে এখানে হাজির। মনোদা, ওদিকে কোথায় দেবী ব্যানারজি কে আছে চেনেন? ফার্ম না কা আছে। তার মেয়ে। কলকাতায় থাকে।

মনমোহন বলল, হুঁ। চিনি। তারপর?

তারপর আর কী? আমাদের এখানেও এল। খানিক গল্প করে চলে গেল। কেমন ন্যাকান্যাকা কথা—শুনলে গা জ্বলে যায়। সঙ্গে একটা মুসলমান মেয়েও ছিল। পায়রাডাঙায় থাকে।

অ। তা রেখা, তাই নিরঞ্জনকে ডাকতে গিয়েছিলে তখন?

এই! ফের বিছানায় ছাই ফেলা হচ্ছে? এ্যাসট্রে দিলাম না?···

রেখা ঝুঁকে বিছানায় ফুঁ দিতে গেলে মনমোহন হঠাৎ ওর একটা হাত ধরল এবং সঙ্গে সঙ্গে রেখা ঘুরে সোজা হয়ে বসল। বলল, ছাড়ুন। বউদির বাড়ি যাব।

মনমোহন হাতটা ছেড়ে দিলে সে চলে গেল।

মনমোহনের বুকে ঢেঁকি পড়ছিল। কী মানে হল এটার? কীভাবে নিল রেখা? কী লজ্জা, কী লজ্জা! কেন হঠাৎ এমন করে বসল সে?···

খাওয়ার পর সত্যি ঘুম পাওয়া অভ্যাস আছে তার। কিন্তু ঘুম আর এল না। তার শরীরের ভারবোধটা কাটছিল না। সে নিজের ওপর রেগে লাল হয়ে যাচ্ছিল। রেখার মতো একলা নিজের খুসি মতো বাড়তে পারা মেয়ে খারাপ হতে পারে, কিন্তু মনো, তোমার তো একটা বিবেকটিবেক থাকবে—না কী হে? তুমি ব্যাটা একটা ঘাগী বদমাস, লম্পটের হদ্দ। তোমার সব জায়গায় ওঁৎ পাতবার অভ্যেস। সবার পিছনে ছোঁকছোঁকামি। তুমি নির্ঘাৎ মরবে।

তক্ষুণি রেখা ফিরে এল। মনমোহনের দিকে না তাকিয়ে আলনা থেকে জামা পাড়তে থাকল। উঠোনে টিউবেল। পশ্চিমের জানালাটা খুলে দিলে সেটা মনমোহন দেখতে পাবে। সে বলল, কী হল? এক্ষুণি গেলে আর এলে!

রেখা আলমারির মাথা থেকে সাবানকৌটো নিয়ে বলল, দরজা বন্ধ। ঘুমোচ্ছে।

রেখা?

উঁ?

তুমি রাগ করেছ?

যাঃ। রাগ করবো কেন? তাহলে কথাই বলতাম না।

কী একটা গাড়িফাড়ি এল মনে হচ্ছে—আমি উঠি।···মনমোহন উঠে বসল।

ঘুমোবেন না?

নাঃ।

মাথা নিচু করে বেরিয়ে গেল মনমোহন। নিরঞ্জনের ঘরের জানালা বন্ধ। কোন দেওর এসেছিল—পায়ে রক্ত · মরুক গে। সে হনহন করে ষ্টেশনে গিয়ে ঢুকল। দেখল বড়বাবু শক্তিব্রত টেবিলে চিৎ হয়ে নাক ডাকাচ্ছেন। এক দঙ্গল যাত্রী প্ল্যাটফরমের গাছতলায়, আর বারান্দায় ভনভন করছে। কেউ কেউ দরজায় উঁকি মেরে চলে যাচ্ছে। মনমোহনের একটু অস্বস্তি হল। সেদিনের মত সব ক্ষেপে ধন্ধুমার লাগাবে না তো? শক্তিব্রতর ঘুমটা ঠিক হচ্ছে না। নিরঞ্জন টিকেট মেলাচ্ছিল। ওকে দেখে একটু হাসল।···ঘুমিয়েও সুখ নেই কে বলে! দাদার কাণ্ড ছাখো।

মনমোহন কাছ ঘেঁষে দাঁড়াল।···তোমার কে ভাইটাই কী এ্যাকসিডেন্ট করেছে রাত্তিরে!

নিরঞ্জন হাত বাড়িয়ে আলমারির উঁচু থাক থেকে একটা থার্ডক্লাস টিকেট টানল। তার নম্বর টুকতে টুকতে বলল, হুঁঃ। আর বোলো না!

হসপিট্যালে দিলে না কেন? নাকের ডগায় থাকতে!

নিয়ে যাবো কিসে? আর যাবেই বা কে?

রিকসোই যথেষ্ট। এ্যাকসিডেন্ট ইজ এ্যাকসিডেন্ট।

নাঃ, তেমন কিছু নয়।

রেখা বলছিল, খুব রক্তটক্ত···

নিরঞ্জন অকারণ ঝাঁঝে বলল, রেখা ওই রকমই বলে। মনো, বাঁটুল বাবুর ট্রলি এসেছে। রামশরণকে দিয়ে খবর পাঠাবো ভাবছিলুম। ফিরবে তো? নাকি, দাদার ওখানে দিনটা কাটাবে?

নিরঞ্জনের চোখ দুটো নিষ্পলক। মনমোহনের ঘেন্না করে। কেন করে, সে জানে না। নিরঞ্জনকে সে দুচোখে দেখতে পারে না। কেন পারে না, তাও জানে না। আরে বাবা, নিজের কোনটা কেন, জানতে পারলে তো তুমি স্বয়ং ভগবান হয়ে বসতে। বাঁটুলবাবু কেন শক্তিব্রতকে দেখতে পারে না, সেও কি জানে? ওটাই মানুষের রহস্য। গার্ড আকবর বলে, তাদের ধর্মে নাকি আছে এমন কথা—যে নিজেকে চিনেছে সে খোদাকেও চিনেছে। মোদ্দা কথাটা হচ্ছে এই।

মনমোহন লম্বা পায়ে শক্তিব্রতর কাছে গেল। কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, দাদা, গেলুম!

লাল চোখে তাকালেন শক্তিব্রত। ফের বুজে বললেন, আচ্ছা।

দাদা, বাঁটুলের ট্রলি এসেছে।

আচ্ছা।···শক্তিব্রতর নাক ডাকতে লাগল।

মনমোহন বাইরে বেরিয়ে দেখল, প্লাটফরমের শেষে শিমূলগাছের নিচে বাঁটুলবাবু দাঁড়িয়ে আছেন। টাকে টুপির হাওয়া দিচ্ছেন। ট্রলি লাইনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওকে দেখে বললেন, এস মনো। কাল রাত্তিরে ফের ওয়াগন ভেঙেছে হে! সিগন্যালের ওখানটায় চাপচাপ রক্তও দেখে এলুম।

মনমোহন ঘড়ঘড় করে বলল, হুঁ। রক্ত তো থাকবেই।

বাঁটুলবাবু বললেন, আরে কী কাণ্ড। পায়রাডাঙা ফরেষ্টের ভিতর পুলিশ একটা লাস পেয়েছে শুনেছ? মুণ্ডু নেই।

বলেন কী!

ওই তো—এখনও সব রয়েছে ওরা। আইসাইট ভালো থাকলে তুমিও দেখতে পাবে। পাচ্ছ না? লাল টুপির ফুল ফুটেছে। দেখছ না?

মনমোহন চেষ্টা করে বলল, কই? ও তো গাছের মাথায় লাল ফুল।

বারে। আসবার সময় দেখে এলুম। তুমি শুধু ফুলটুল দেখতেই ওস্তাদ। তোমার বসন্তকাল। যাক্ গে, ওঠ।

বাঁটুলদা, থাক্। আপনি যান।

কেন?

শক্তিদার সঙ্গে কিছু কথা ছিল। ভুলে গেছি।...

বাঁটুলবাবু হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকলেন কয়েক মুহূর্ত। তারপর বললেন, আবদুল, নসীরাম, কোথা গেলিরে বাবা? আয় সব। যা চ্চলে! চায়ের দোকানে চলে গেছে সব। কী ল্যাঠা! ফিরে চানফান করব ভাবছিলুম। তিনটে বেজে গেল যে!

মনমোহন প্লাটফরমে তখন হনহন করে এগোচ্ছে।

নিরঞ্জন ডাকছিল, দাদা, শক্তিদা, উঠুন। গাড়ি আসছে। লছমী, ঘণ্টা দে।

শক্তিব্রত চোখ খুলে বললেন, কোন গাড়ি?

এইটিন ডাউন।

সেরেছে!

সেরেছে মানে?

লাইন ক্লিয়ার পেয়েছ?

হ্যাঁ। উঠুন।

শক্তিব্রত উঠলেন লাফ দিয়ে। তারপর ওকোণায় মনমোহনকে দেখে বললেন, আরে, বাঁটুলবাবুর ট্রলি এসেছিল না?

মনমোহন বলল, যাইনি। বাঁটুলের সঙ্গে বনে না আমার।

ভাল করেছ। ও ব্যাটা খচ্চরের রাজা। গাড়িতেই যাও। রথ দেখা কলা বেচা দুইই...হ্যাঃ হ্যাঃ হ্যাঃ।

নিরঞ্জন ঠাট্টা করে বলল, লম্বা ঘুম দিয়ে এল আপনার কোয়াটারে। মনো তো খেতে পেলে শুতেও চায়।

মনমোহন কিছু বলল না। আলো জ্বলেছে চারদিকে। সে

আলোগুলো খুঁটিয়ে দেখতে থাকল—ঘরের ভিতর এবং বাইরে। ছটা পঞ্চান্নতে ডাউনটা পৌঁছচ্ছে। পরের দুটো ডাউন গাড়িও লেট করবে স্বভাবত। আপগুলোর এখনও খবর নেই। কী অব্যবস্থা চলেছে সবখানে। দেরী না করে কেউ আসতে চায় না। যত সব ফাঁকিবাজ জুটেছে!···

তারপর ট্রেন এসে গেল। হইহই রইরই ব্যাপার কিছুক্ষণ। তারপর ফের সব চুপচাপ। মৌরীগ্রাম ষ্টেশনের অগাধ স্তব্ধতা। প্ল্যাটফরমে দুটো কুকুর খেলা করছে। পিপুলগাছের ছায়ায় মোটঘাট নিয়ে বসে আছে একটা পরিবার। আপে যাবে। সেই দুপুর থেকে বসে রয়েছে। শক্তিব্রত চশমা পরে ভারি খাতাটা টেনে নিচ্ছেন। নিরঞ্জন বাইরে দাঁড়িয়ে আছে কী জন্যে।

পিছনের ছোট্ট বাজারে কয়েক চিলতে আলো। তার ওদিকে গাছপালার ভিতর রেলের একটা ফ্যাকটরি। ছড়ানোছিটানো সব কোয়াটার। আরও পিছনে বসতি। স্কুল কলেজ। হাসপাতাল। গোল পার্কটুকু ঘিরে রিকসোর আনাগোনা চলেছে। ফের এনকোয়ারি নাকি—রাত্রি বেলা? পুলিশ আসছে কজন। ও-সি সমাদ্দারবাবুও আছেন। আর ভ্যানতারা ভাল্লাগে না কাল থেকে। নিরঞ্জনের মুখ বিকৃত হয়ে গেল। শুওরের বাচ্চা পান্নাটা···

এই যে ছোটবাবু!···সমাদ্দার এসে গেল।

নমস্কার। আসুন, আসুন।

সমাদ্দার হাত ধরল হঠাৎ।···একবার বিরক্ত করব ছোটবাবু। একটুখানি কোয়াটারে যেতে হবে আমার সঙ্গে।

নিরঞ্জন চমকে উঠল। ··কেন, কোয়াটারে কী হল?

চলুন না, বলছি।

ফারুকের সাইকেলের দোকান থেকে দৌড়ে বেরিয়ে এল চিনু। তার পিছনে আরও দুজন। পিছন থেকে ফারুক বলল, শিগগির! পান্নাদারা এখনও বেরোয়নি!

সোলেমান! কে চেঁচিয়ে উঠল কোথাও।···ঠিক সে খাড়া হো যাও।···

সমাদ্দার নিরঞ্জনের হাত ধরে পার্কের কাছে আসছেন। জনাচার কনষ্টেবল—রাইফেল কাঁধে। কী ভেবে সমাদ্দার রিভলভারটা বের করলেন। পরক্ষণেই চেঁচালেন, তেওয়ারী! ওই সাইকেলটা আটকাও। শামসুল! কুইক।

আচমকা বোমা ফাটল সামনে। আবার। আবার। সমাদ্দার চেঁচিয়ে কী বলতে যাচ্ছিলেন—কপালে কী এসে লাগল। পড়ে গেলেন। নিরঞ্জন এক দৌড়ে কোয়াটারে গিয়ে ঢুকলো। অনু বেরোচ্ছিল। তার ধাক্কায় মেঝেয় মুখ থুবড়ে পড়ল। দরজা বন্ধ করে দিল নিরঞ্জন।

বাইরে পান্নাবোসের গলা।···সাবাড়!

মানুষের আওয়াজ নয়, অদ্ভুত একটা গোঙানি—একটানা। সা—বা—ড়! আওয়াজটা প্রচণ্ড সাহসীরও বুকের রক্ত ঠাণ্ডা করে দেয়।

সেই সঙ্গে হা—রা—রা—রা—রা! বিকট সম্মিলিত গর্জন। মাটি ফুঁড়ে ছায়ার মত কারা গজিয়েছে চারপাশে। কনষ্টেবল তেওয়ারী-শামসুলরা পিছু হটে এলোমেলো গুলি ছুঁড়ছে। বারুদের কটু গন্ধ চৈত্রের বাতাসে। অন্ধকার ধোঁয়ার কুয়াসাজড়ানো। বাজার চকিতে বন্ধ। তারপরই আলো নিভে গেল—একসঙ্গে সবগুলো আলো। সব ঘরের দরজা জানালা বন্ধ হতে থাকল। কানে তালা ধরিয়ে দিল মুহুর্মুহু বোমা ফাটার আওয়াজ। কী ঘটছে, কেন ঘটছে—কেউ টের পাচ্ছিল না।

ষ্টেশনঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন শক্তিব্রত। বাইরে থেকে কারা জোরে ধাক্কা দিচ্ছিল।···খুলুন, খুলুন বড়বাবু।···আরে, ও মশাই, খুলুন না শিগগির! কে করাত চেরা গলায় চেঁচাচ্ছিল—আমার ফ্যামিলি···বড়বাবু! আমার নাবালকরা···বড়বাবু, বাঁচান···

রামশরণেরও আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছিল। কাকে বলছিল, আবে শালা লোগ্, ইধার কাঁহা ঘুস্‌তা? এ অন্ধা! ছোড়, শালা, ছোড় দে! ঘোলি চল্ রাহা···

প্লাটফরমের সেই অন্ধ ভিখিরিটা। ওভারব্রীজের নিচে দুজনের হুড়োমস্তি। ওপর থেকে এতক্ষণে রেলপুলিশের রাইফেল সাড়া দিল। টর্চের আলোর কাটাকুটি চলল অন্ধকারে—এ্যাবষ্ট্রাকট্ চিত্রকলার মতন।

শক্তিব্রত ষাঁড়ের মতন ঘাড় নুইয়ে দাঁড়িয়েছিলেন এককোণায়—দুহাতে চেয়ারের হাতল। রেখার কথা ভাবছিলেন। হঠাৎ খেয়াল হল, জংশনে ফোন করতে দেরী হয়ে যাচ্ছে। দেশলাইয়ের আলোয় কোণের কাছে গেলেন। হ্যালো জংশন,···হ্যালো! কে বলছেন? অ। এখানে ইয়ে—মানে···আরে! হ্যালো ··হ্যালো ··হ্যালো···! ধুস্ শালা! কেটে গেল?

ফোন ফেলে দিয়েই বাইরে যেন শুনলেন রেখার কণ্ঠস্বর—বাবা, ও বাবা!

সুতরাং দরজা খুললেন। বানের জল ঢোকার মতো কারা যেন ঢুকে পড়ল হুড়মুড়িয়ে। শক্তিব্রত চেঁচালেন, রেখা!

হ্যাৎ! কানের ভুল।

পরক্ষণে টের পেলেন, এই লোকগুলো চেঁচামেচি করে তাঁকেই খুঁজছে।···মার, মেরে সাবড়ে দে শুওরের বাচ্চাকে। এতগুলো প্রাণ নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে শালা। মার্, মার।···ষ্টেশন ওর বাপের সম্পত্তি? কই, কই, কোথা গেল সেই দালালটা?···

অন্ধকারে পিছু হটে-হটে টেবিলের নিচে গিয়ে ঢুকলেন শক্তিব্রত।

দেশলাই জ্বলে-জ্বলে নিভে যাচ্ছিল এখানে-ওখানে। তারপর কে চেঁচিয়ে উঠল, পেয়েছি, পেয়েছি! তারপর কিল চড় থাপ্পড় ঘুঁষির শব্দ অন্ধকারে। শিশুর কান্নাকাটি, স্ত্রীলোকের ফুঁপিয়ে ওঠা, এইসব ভুতের কেত্তন।

বাজখাঁই চেঁচিয়ে কে বলল, আমি নই, আমি নই। আমি মুকুন্দ গড়াই, চাঁপাহাটার মুকুন্দ, শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছিলুম···ওরে বাবা! দেখুন, দেখুন না স্যার—আমার গায়ে এটা রেলকোট নয়, সত্যিকার কোট···উঃ মা গো

সেই মুকুন্দ বুক ফেটে কেঁদে উঠেছে।

তারপর পাওয়া গেছে বড়বাবুকে। দরজার মুখে ধরে ফেলেছে। সত্যিকার কোট নয়, রেলকোট। বোতামে পকেটে কাঁধে হাত বুলোলেই মালুম। অতএব—

শক্তিব্রত দাঁতে দাঁতে চেপে উপুড় হয়ে পড়লেন। উন্মূল একটা গাছের মতন। এবং ঈশ্বর গাছকে কথা বলতে নিষেধ করেছেন

॥ চার ॥

ঘরটা বেশ ছোটই। বড়জোর আট ফুট-ছ'ফুট মাপের মেঝে। দেয়াল এবং মেঝে মাটির। অসমতল। কবে একবার হয়তো রাঙামাটির লেপন দেওয়া হয়েছিল। এখন সবখানে ম্লানিমা এবং সরু ফাটল। খড়ের চাল! টিকটিকির সাদা ডিম। আরশোলাও আছে কিছু। ঝুলপড়া চালটা লম্বা মানুষ হাত বাড়িয়ে ছুঁতে পারে। তার বাঁশে ও বাতার কাঠামো ঘুণে ঝাঁঝরা। হলদে গুঁড়ো ঝরে পড়ছে মাঝেমাঝে।

আনাড়ির হাতে তৈরী তা বোঝাই যায়। এবং এও বোঝা যায়, ঘরের প্রতি যার মোহ নেই, নিতান্ত জিরোবার ডেরা যার ছিল জরুরী,—এর মালিক সেই। ছন্নছাড়া এবং বাউণ্ডুলে। তবু অবাক লাগে, দেয়ালে কে দিয়েছিল ওই রাঙামাটির লেপন? কে কবে এঁকেছিল ওই পদ্মফুল পাখি গাছের পাতা? সে মেয়ে তো বটেই। কেমন মেয়ে? কোথায় সে?

ঘুণলাগা বাঁশের আলনায় ঝুলছে একরাশ ময়লা ছেড়াখোড়া কাঁথা। তেমনি কিছু কাপড়চোপড়। একটা শাড়ির পাড়ও দেখা যাচ্ছিল।

একটামাত্র তাক। তাকে একগাদা শিশিবোতল, ভাঙাচোরা তোবড়ানো কৌটো—স্নোর। সাবানকৌটো আছে। একটা পারাচটা আবছা আয়না। দাঁততাঙা চিরুনী। যেন কবে এখানে ছিল একটা রূপময়তার ছোট্ট জগৎ, ছিল সৌন্দর্যকে ডাক দেবার গভীর কাকুতি—আজ সব সাজানো বাগান ছারখার। আজ ওখানে দাঁড়ালে সৌন্দর্যকে মিথ্যে লাগে। বিনষ্ট দালানের সামনে দাঁড়িয়ে যেমন বিষাদকে দেখা যায় খুবই কাছাকাছি। তেমনি বিষাদ চুপি-চুপি ছায়া ফেলে।

দেয়ালে ঝুলছে একটা ক্যালেণ্ডার—অনেক পুরনো। ছবিটা অবাক করে। কী ও? মুখটা সুন্দরী কেশবতী রমণীর, দেহের সবটাই যেন ঘোড়া—পিঠে তার সুদৃশ্য নকশাকাটা জিন।

এই প্রাগৈতিহাসিক—আদিম জীবনধারণের মাঝে কিসের একটা প্রতীক যেন। সমু খুঁটিয়ে দেখে নিল সবকিছু। তারপর একটু হেসে ডাকল, মঘাদা!

লোকটা বাঁশবাতায় তৈরী দরজাটা আদ্ধেক ভেজিয়ে সেখানে পিঠ রেখে বসেছে। বাইরে থেকে হিরন্ময় সকালের আলো সাবধানে এসে ভরিয়ে দিচ্ছে ঘরখানা। এ আলোয় ওর মুখের দিকে তাকালে আত্মা ভীত হয়। তার মুখে বসন্তের দাগ। একটা চোখ বীভৎসভাবে খোলা, ওল্টানো, তারা নেই, ডিমের মতন, এবং নিষ্পলক সেকারণে। অন্যটা দৃষ্টিবান—বড়ো, তীব্র, জ্বলজ্বলে। সেই বেঁচেথাকা চোখে কতক্ষণ থেকে দেখছিল সমুকে। রাত্রেও দেখছিল, কথা বলেনি! সমুর অস্বস্তি হচ্ছিল। পায়ের যন্ত্রণা এবং এই একটা কুৎসিত লোক তাকে নিঃশব্দে দেখছে। তার থ্যাবড়া নাকের ফুটোদুটো এত স্থির যে শ্বাসপ্রশ্বাস চলছে কিনা বোঝা যায় না। বালিশের পাশ থেকে একটা ট্যাবলেট নিয়ে গিলেছিল সে। মাথার পাশেই একটা এনামেলের ঘটিতে জল ছিল। তারপর ঘুমিয়ে পড়ে সমু। কিন্তু এখন মনে পড়ছে, ঘুমের মধ্যেও সে অনুভব করছিল ওর অস্তিত্ব—একটা চোখ দিয়ে তাকে যেন চেটে-চেটে খাচ্ছে কোন প্রাগৈতিহাসিক জানোয়ার।

সাড়া দিচ্ছেনা দেখে ফের সে ডাকল, মঘাদা!

হুঁ!

ওই ছবিটা কিসের?

বোররাক।

তার মানে?

তুমি হেঁদুর ছেলে—অত খবরে দরকার কী?

তুমি কি আমার ওপর রাগ করেছ মঘাদা?

একচোখো লোকটা কেমন ঘোঁত ঘোঁত করে হাসল।...আমার রাগ নাই।

ওই ছবি কিসের?

বোররাক। ওর পিঠে চেপে পয়গম্বর গিয়েছিলেন খোদার কাছে।

সমু একটু চুপ করে থেকে বলল, তুমি নমাজ পড়না মঘাদা?

নাঃ।

কখনও পড়নি?

নাঃ।

পড়তে ইচ্ছে করে না?

অত কথা ভালো না। তুমি ছেলেমানুষ।

তাহলে এ ছবি ঘরে রেখেছ কেন?

আমি রাখিনি। যে রেখেছিল, সে ওসব মানতো-টানতো। বেহেশতে যাবার ইচ্ছে ছিল।

তোমার বউ বুঝি? কোথায় সে?

লোকটা ফের হেসে ফেলল। তারপর দরজাটা একটু ঠেলে বাইরে থুথু ফেলল। ঘুরে বসে বলল, আচ্ছা, একটা কথার জবাব দাও তো শুনি—আমার খবর তুমি পেয়ে যাবে'খন। ঠিক ঠিক জবাব দেবে কিন্তু।

দেব।

তুমি তো ভদ্রলোকের ছেলে। লেখাপড়াও শিখেছ। কেমন?

হুঁ।

তুমি কলম বাগিয়ে চাকরী করবে। মাগ লিয়ে বায়স্কোপ দেখবে। কেমন?

হুঁ-উ।...সমু সকৌতুকে বলল।

ঝুঁকে এল সে। একটামাত্র চোখে যে জ্বলজ্বলে দৃষ্টিটা ছিল, হঠাৎ আরও তীব্র হল। বলল, তোমার এ দশা কেন ছোটবাবু?

সমু হেসে বলল, আমি ছোটবাবু-টাবু নই।

বলতে ইচ্ছে করে। পান্নাবাবুকে আমি যদ্দিন চিনেছি, তদ্দিন থেকেই বড়বাবু বলি। তেনার ভাই তুমি—কাজেই ছোটবাবু।

বেশ। হলুম।

ছোটবাবু, তোমার এ দশা কেন?

কী দশা?

ফাজলেমি করোনা সোনা। এ মঘা আজ খোঁড়াখঞ্জ মানুষ, আজ কাদায়পড়া হাতি হয়ে আছি—চামচিকেয় লাথি মেরে যাচ্ছে, কিন্তু একদিন মঘার নামে অনেক বড়-বড় সাহসীপুরুষের কলজে নড়ে উঠেছে। সে 'হিস্‌টি' তোমার দাদার কাছে শুনো। ফারুও বলবে। মঘা—মগরেব ডাকাতের নাম এ লাইনের উত্তর-দক্ষিণ যে ইষ্টিশেনে যাবে, শুনবে।

বেশ তো!

ছোটবাবু, আমার পাখানাও তোমার মতন গুলিতে খেয়েছে। পা হারালে মানুষ মুড়ো গাছের অধিক। রাখালেও মুতে দেয়। শুনছ, না ঘুমুচ্ছো?

চোখ খুলে সমু খুব আস্তে বলল, শুনছি।

মঘা ছবিটার দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি যেখানে শুয়ে আছো, সেখানে শুয়ে একদিন একটা মেয়েমানুষ আমাকে বলেছেল,—মিনসে, এ লাইন ছাড়ো—বড় গোনার কাজ। ছাড়লে দেখবে হুই বোররাক এসে তোমাকে তুলে লিয়ে যাবে। সাত আসমান পেরিয়ে খোদার রাজ্যিতে হ্যাঃ হ্যাঃ হ্যাঃ!···খুব হাসতে লাগল সে।···তা ছোটবাবু, খোদা কী তা ভাবিনি—আজও ভাবিনে। আমি হারামীর বাচ্চা মগরেব আলি, শয়তানের বাদশা হয়ে ভালই ছিলুম। যেদিকে তাকাই আর বলি, এসব আমার—আমার হয়ে যায়। যেখানে যাই, দেখি, তুলে লিই···

সমু বলল, ভিনি ভিডি ভিসি!

কী বললে?

এলুম, দেখলুম, জয় করলুম।

ফ্যাঁচ করে হাসতেই থ্যাবড়া নাক থেকে সর্দি বেরিয়ে এল। কাপড়ে মুছে সে বলল, আড়বুলি। আমরাও বলতুম। বাইরের লোকে টের পেতনা কিচ্ছু। শুনবে নাকি?…পাক্কি টাকালু? পেকেটে হেঁকেটে দাং। রুলি রুলি? বিযোড় লিস। মানে—খুব বড় লোক—অনেক টাকা আছে? হ্যাঁ, পকেটে আছে,—বাড়িতে আছে।…এখানেই ধরব?…কামরা ফাঁকা হোক—বিযোড় লিস্। বাঞ্চোৎ পেসেঞ্জাররা কিচ্ছু বুঝতে পারে না। ছোটবাবু, তোমাদের আড়বুলি কেমন যেন। কী বলছিলে, ভি…ভি…

সমু বলল, আচ্ছা মঘাদা, তুমি ডাকাত হয়েছিলে কেন?

মঘা একটু ভেবে বলল, কঠিন প্রশ্ন। প্রশ্নটা লতুন লয়। আম্মো ভেবেছি কতবার। জবাব একটা থাকে। তবে কী, মোন ভরে না। বুঝলে ছোটবাবু?

কী জবাব?

অভাব ছেল। বাপ ছেল ফকির-ফাক্‌রা মানুষ। ভিক্ষে করে খেত। কাজেই অভাব অবশ্যি ছেল। কিন্তু অভাব আছে বলে তো সব্বাই ডাকাতি করে না। তাহলে? সার কথা কি জানো ছোটবাবু? ওটা নেশা। রক্তে নেশা ঢুকে যায়। আর, যার রক্তের জোর যেমন, সে তেমন পারে। কেউ ঝিঙেপটল চুরি করে, কেউ সিন্দুক ভাঙে—আবার কেউ বাগে পেলেই খুনখারাপি করে বসে। মঘার রক্তের জোরটা ছেল বেশি। তার সোনা দানার লোভের চেয়ে খুনের দিকে ঝোঁক। তাই তাকে এত ডর ছিল মানুষের। মঘা একবার মাত্তর কানের দুলের জন্যে একটা মেয়েমানুষ খুন করেছেল ছোটবাবু।

সেজন্যে তোমার কোনদিন কোন কষ্ট হয়নি মনে?

ছোটবাবু, তোমার চোখে ঘেন্নার ছোপ পড়েছে। তুমি মঘাকে ঘেন্না করছ।

তোমার কোন অনুতাপ নেই মঘাদা?

কী তাপ বললে? তোমার ওই ছিক্কিত বুলি আমি বুঝিনে।

তবে যদি বলো, তাপ—সেটা বুঝি। তাপ আবার নাই? হু হু করে জ্বলছি। ঠ্যাংকাটা চিতেবাঘ কখনও দেখেছ? পাছা ঘেঁষড়ে হাঁটে। বুড়ো বয়সে আমার বড় জ্বালা গো, বড় জ্বালা। এখন নিজের রাগে নিজের গতরটা ছিঁড়ে খেতে ইচ্ছে করে। সারারাত্তির আমি ঘুমোইনে ছোটবাবু। আমার ঘুম নাই। ঘুম যদি বা আসে, কানদুটো জাগে। ওই বুঝি ডাক এল, ওই বুঝি সাগরেদরা এতক্ষণ জড়ো হয়েছে 'লিব্বংশ বটগাছে'র তলায়—মাঠের মধ্যিতে, আমি শালা মঘা ওস্তাদ শুয়ে আছি কেন?···হুড়মুড়িয়ে উঠতে গিয়ে সব ভণ্ডুল। তখন—তখন আমি কাঁদি ছোটবাবু। একলা ঘরে লুকিয়ে-লুকিয়ে কাঁদি। আঃ, তাপে আমার দেহখানা জ্বলে গেল গো!

সমু দেখল, ওই বীভৎস মুখের ওপর একটা মাত্র জীবিত চোখ থেকে কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে এল। অবিশ্বাস্য। সমু চোখ বুজল। তার গা ছমছম করছে। ওই লোকটার মধ্যে যেন একটা ভীষণতম অন্ধতা, আর একটা গভীরতম দৃষ্টিময়তা কাজ করে যাচ্ছে।

ছোটবাবু?

উঁ?

আজ আমিও বাপের মতন ভিক্ষে করে খাই। ছেলেপুলেরা গুঁতিয়ে দেয়, ঢিল ছোঁড়ে, টিটকারি করে—ওই হারামী ডাকাতটা যাচ্ছে! কেউ মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দ্যায়। কেউ দয়া করে বলে, আহা, তবু তো মানুষ বটে!···দয়া! আমার মাথায় খুন চেপে যায়। আমি সত্যি সত্যি একটা বোররাকের জন্যে মোনে মোনে ইচ্ছে করি—একবারের জন্যে যদি পাই, চেপে চলে যাবো বেহেশতে। খোদাকে খুন করে আসব···হেঁ হেঁ হেঁ!

হাসছ যে?

হাসছি। মনের ভরম। তবু জ্বালার ক্ষান্তি তো নেই। শুনলে তুমিও হাসবে—একবার এক বিধবা দয়া করে একথালা ভাত খেতে ডেকেছেল। হেঁদুর বেধবা। বলেছেল, আর জাত মেনে কি হবে

বাবা? যার ভাত নেই, তার জাত নেই।···ওরে শালীর বেটি! আমি মঘা—আজ আমি জাতছাড়া? রেতের বেলা কেরাচে (ক্রাচ) ভর করে বেরিয়ে পড়লুম। দিলুম গে শালীর খড়ের চালে আগুন!

কোণে দাঁড় করানো সস্তা ক্রাচদুটো এতক্ষণে নজরে পড়ল সমুর। সে জিজ্ঞেস করল, ওটা কে দিয়েছে তোমাকে?

হাতেম চৌধুরী। যৈবনে ওনার হয়েও অনেক কাজ করেছি কিনা। রাগে দুঃখে ভিক্ষে ছেড়ে দিয়েছিলুম। না খেয়ে জানটা যাবার দাখিল। তো, ওনার একটি সুন্দর পানা মেয়ে আছে—কলেজে পড়ে। তার কেন কে জানে, আমার ওপর বেজায় ভক্তি। দোরে গেলে সবসময় জ্বালাত—চাচা একটা গপ্প বলো, গপ্প বলো। ···কিসের গপ্প শুনবি মা?···না, তোমার ডাকাতির।···রসিয়ে-রসিয়ে, ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে একশোখান করে বলতুম, সে কান করে শুনত। মেয়েছেলের এ কী নেশা ছাখো!···সেই পেথম ব্যবস্থা সুরু হল। গপ্পের বদলে পেট ভরে খেতে পাই। তাপরে তো ও বড় হল। তবে কি জানো ছোটবাবু, মেয়েটার যদি তেমন ঘরে জন্মো হত, ও শালী বেটি নির্ঘাৎ খুনে ডাকাতনী হত। এখনও···

সমু বলল, তাকে আমি চিনি।

চেনো নাকি? তা চিনতেও পারো। ও তো তোমাদের মতনই ছিক্কিত—কলকাতাও যায় যখনতখন। কে বলে মোছলমানের মেয়ে! চেহেরাখান যেন ডাকলে রা কাড়ে।

সমু একটু হাসল। তুমি একটা কথা জানতে চেয়েছিলে মঘাদা। আমার এদশা কেন!

মঘা কান থেকে আধপোড়া সিগ্রেট বের করে দেশলাই জ্বালল। কয়েকটা বিকট টান দিয়ে তারপর বলল, তখন ইচ্ছে ছেল জানবার—এখন আর নাই। জেনে কী হবে? বড় জোর বলবে, রক্তের নেশা। আবার কী? সেই বাসি কথা।

সমু কনুই ভর ঘাড় তুলে তীব্রস্বরে বলল, না।

না?···একবার তাকিয়েই মঘা মুখ ফেরাল। পুরু ঠোঁটে বাঁকা হাসি।

হ্যাঁ, নেশাফেশা মিথ্যে।

তবে কী? অভাব? গরীব ঘরের ছেলে তুমি—সেজন্যে···

বাধা দিল সমু। সেজন্যেও না।

কীজন্যে?

সাজানো গোছানো এই পৃথিবীটা আমার দুচোখের বিষ। সমু হাঁফাতে হাঁফাতে বলতে থাকল—যেন এতদিন পরে বলবার মত লোক পাওয়া গেছে। আর জানো মঘাদা, মানুষ—মানুষকে আমার বড্ড ঘেন্না।

হাত তুলল মঘা—থ্যাবড়া ভয়ানক হাতটা। থামিয়ে দিয়ে বলল, থেটার করোনা ছোটবাবু। কারা শুনবে। বিপদ বাধবে।

সমু রুদ্ধশ্বাসে বলল, তুমি বুঝতে পেরেছ কী বলছি?

একটু-একটু। কিন্তু···মঘা হাসল।···কিন্তু দুনিয়া মানুষ লিয়ে এমনি করেই চলছে। চিরটাকাল চলবে। তোমার রাগটা ব্রেথা।

সমু জবাব দিল না। সে ভাবছিল, হঠাৎ কী সব বলে ফেলল এই লোকটার কাছে। ও কি শুধুই মঘা ডাকাত? যেন সমুর কাছে ওর অন্য কী একটা অস্তিত্ব ধরা পড়েছে। সেই অস্তিত্বের একদিকে অন্ধতা, অন্যদিকে দৃষ্টিবত্তা—একপাশে অন্ধকার, অন্যপাশে আলো। বড় রহস্যময় এই লোকটা। তাই কি এ অভুতপূর্ব মিথ্যে আবেগের জোয়ার এল?

এ তোমার নেশা। বুঝলে গো? নিতান্ত নেশা। হয়তো আরো পাঁচটা ছেলের চেয়ে রক্তের তেজটা বেশি। প্রথমে ছোট খাটো, তাপরে ক্রিমশো বড়, ক্রিমেক্রিমে আরো বড়···

যাও। আমি চোরডাকাত নই। তবে বোমাবাজী করেছি, গুণ্ডামি খুনোখুনি আমার ভাল লেগেছে—এইমাত্র। সমু বিরক্ত হয়ে বলল।

অই—অই হল ব্যাপার। মঘা সোৎসাহে বলল। ভাল লাগা।

কারো-কারো রক্তে যেন পারার দোষ থাকে। লাল মিয়া দারোগা একথা বলতেন। তখন তোমাদের জন্মোই হয়নি।

সমু বলল, আচ্ছা মঘা, খুন করতে তোমার বা তোমার সাগরেদ-দের কখনো হাত কাঁপতনা? কেমন করে খুন করতে?

গপ্প শুনবে? নাজু মায়ের মতন?···মঘা হাসল ফের।···তা আমরা চোখ বুজে ঝেড়ে দিতুম হেসোর কোপ, আবার কী? সত্যি বলতে কী, মানুষ তো বটি। লাস দেখতে গা বাজে না?

পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে গলা কেটেছ কখনো? সে তাকিয়ে আছে তোমার দিকে—তুমিও তাকিয়ে দেখছ তাকে—আর গলায় ছুরি চালাচ্ছ?

বাস্ রে! আঁতকে উঠল মঘা।···সেটা ঠিক নয়।

আজকাল আমরা তা পারি।

বল কী? মঘা অবশ্য বিস্মিত হল না। সে বলল, শুনেছি কিছু কিছু। ফারুক তোমাদের দলের নোক—সে বলেছে অনেক কিছু। তবে ওরকমটা শুনিনি। তুমি কারও গলা পেঁচিয়ে কেটেছিলে নাকি?

নাঃ। তবে, অনেকেই আজকাল কাটছে। লাসের মাথাও কাটছে।

কাটতে দাও। ক্ষেতি কী? তবে আমরা পারিনি। যাক্ গে, বেশি বকা হল। জ্বর বাড়বে। ঘুমোও—আমি বেরোব।

মঘা ক্রাচটা টেনে নিল। বগলে ভরে দরজা খুলল। সমু বলল, ফারুক এখনও এলনা। চা খেতে ইচ্ছে করছে।

আসবে'খন। আমার ঘরটা নিরালা জায়গায়—রাতে তো কিছু দেখতে পাওনি। মাঠের ধারে—পুকুরের পাড়ে। পুকুরের পানিটা দেখলে তোমার গা শিরশির করবে—এমন কালো। চাদ্দিকে জঙ্গল—ওধারটায় হাতেম মিয়ার দালানবাড়ি। মঘার বাড়ির দিকে কেউ আসেও না। দিনরাত সুমসাম জায়গা। কোন ডর করোনা। একটু দেরী হবে ফিরতে।

সমু বালিশের নিচে হাত ভরে দেখে নিল—পাল্লাদা দিয়ে গেছে অস্ত্রটা। অটোমেটিক। গুলিও রয়েছে রুমালে বাঁধা। সে বলল, মঘাদা, একটা কথা।

বলো।

চৌধুরী সায়েবের মেয়েকে ডেকে দিয়ে যাবে?

মঘা নিঃশব্দে ঘুরল। তীব্র দৃষ্টে একচোখে তাকিয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। তারপর বলল, না। সেটা পারব না। বড়বাবুর বারণ আছে। তাছাড়া, তোমারও একটা আক্কেল থাকা দরকার বাপু। থাক্, লেজেগোবরে করো না। চুপচাপ পড়ে থাকো।

সমু মিনমিনে গলায় বলল, একা ভাল্লাগে না যে। তুমি ডেকে দাও মঘাদা—ও আমার চেনা মেয়ে। কাকেও বলবে না। খুব বিশ্বাসী।

মঘা কেমন হাসল। ভালো লাগে না একা?

হুঁউ।

ডেকে দেব বলছ?

হুঁ-উ।

কিন্তু মোছলমানের যুবতী মেয়ে—একলা ঘরে হেঁদুর ছেলের কাছে থাকবে—এটা কি উচিত হবে ছোটবাবু? মঘা হেসে উঠল। তার ওপর সে ছেলেটা আবার এ বয়সেই মঘা-টঘার ওস্তাদ হয়ে উঠেছে। এ্যাঁ?

তুমি ডেকে দাও মঘাদা, তোমার পায়ে পড়ি।

ছেলেটা বড় ইয়ে—কেমন যেন···বলতে বলতে মঘা ঘুরল। তারপর তার ক্রাচ দুটোর চাপা খটখট শব্দ শোনা গেল। শব্দটা ক্রমশ মিলিয়ে গেলে জেগে রইল একটা অগাধ নৈশব্দ। অসহ্য লাগল তা। সময়হীন একটা স্থিরতার গ্রাস যেন। এ তার কাছে নতুন অভিজ্ঞতা। একটা দূরস্পর্শী শূন্যতার সামনে সে পৌঁছে গেছে।

তারপর কোথায় একটা কোকিল ডাকল। অমনি, অনুষঙ্গ

বশে, সচেতন হল সে। কাছাকাছি কোথাও হয়তো আমগাছ আছে। মুকুলের গন্ধ ভেসে আসছে না? এখানে চারদিকে জঙ্গল বলছিল মঘা। খুঁজলে গাছপালার ভিতর কত অপরূপ ভাস্কর্য,—তার প্রিয় 'আর্ট' আবিষ্কার করা যেতে পারে সম্ভবত।

কিন্তু গায়ে জ্বর। জ্বরের ঘোরে ভীষণ কথা বলবার ঝোঁক আসে। সহজেই আবেগ এসে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। এতক্ষণে সে বুঝল, মঘার সঙ্গে আসলে ছেলেমানুষীই করেছে। কারণ, সে তো শুধু কাজ করে যায়—কিছু ভাবে না বা ভাবতে চেষ্টাও করে না। নিজের সম্পর্কে কোন প্রশ্নও তো তার নেই। ছিলও না।

তাহলে কোত্থেকে এল প্রশ্ন?

মঘাকে দেখে কি? লোকটার অস্তিত্ব একটা বীভৎস আয়না যেন। ভয় পাইয়ে দেয়। যুক্তি বলতে যা কিছু, যাকে বলে 'রিজ্‌নিং', বড় অকারণ মনে হয়। ওই পান্নাদা, যে মরা ইনদার মুণ্ডু কাটতে পিছপা হয়নি—তাকেও যুক্তি দিয়ে বোঝা যায়। মঘাকে নয়। কিন্তু···কিন্তু তখন ভাবিনি—এখনও মনে হচ্ছে, পান্নাদা মরা ইনদার মাথা কেটেছিল—কিন্তু আমাকে বাঁচিয়ে রাখছে কেন? আর শুধু বাঁচানো নয়—বাঁচানোর জন্যে এতসব খুন জখম লড়াই কেন তার? কাল সন্ধ্যায় ষ্টেশনে যা করেছে, তা একটি যথার্থ যুদ্ধ। পান্নাদা কেন এমন করল? দলের একটা ছেলে বাঁচল-মরল, কী আসে যায় তার? হ্যাঁ—জায়গায় জায়গায় পান্নাদা দুর্বোধ্য যেন। কিন্তু···নাকি···মাই গুডনেস!

চোখ খুলল সমু। হাত চালিয়ে দিল বালিশের নিচে। রিভলভারটা বের করল। মনেমনে বলল, শয়তানের রাজা পান্না বোস। আমি বুঝেছি। পাছে ধরা পড়ে আমি তোমার গ্যাঙের সর্বনাশ করে বসি, তাই আমাকে নিয়ে এত লড়াই তোমার! তাহলে—যদি দরকার বোঝ, আমার গলা কাটতেও তুমি পিছপা হবে না! ঠিক আছে, কাম অন শুওরের বাচ্চা! লেট আস সেটল ইট! তোমার মতলব আমি বুঝে গেছি।

বাইরে পায়ের শব্দ হল চুপিচুপি। ক্ষিপ্রহাতে গুলি ভরল সে। নিঃশব্দে প্রতীক্ষা করতে থাকল। এত শিগগির নাজমা আসতে পারে না। ফারুক—নয়তো স্বয়ং পান্না। পান্না এলে একটা কিছু ঘটবেই। সমু তৈরী।

ফারুকই এল। দরজাটা বিশ্রী শব্দ করে ঠেলল।...কেমন আছিস? আরে—ওটা বের করে কী হচ্ছে? রেখে দে। এই সমু, অটোমেটিক কিন্তু। সবধান।

সমু রেখে দিয়ে বলল, আয়। চা কই?

নাজমা আনছে।

তার মানে?

তুমি শালা এখন হাতেম চৌধুরীর মেহমান। পান্নাদা চৌধুরীকে বলে গেছেন। চৌধুরী সাহস না দিলে এখানে কে ঠাঁই দিত ভাবছ! মঘার অত তাকত ছিল না। তবে চৌধুরীর বাড়ি থাকলে ভালই লাগত তোর। জামাই আদরে কাটাতিস। কিন্তু ও আবার পলিটিকস করে-টরে তো! সব সময় লোকের আনাগোনা হয়! তাই—...যাক্ গে। জায়গাটা নিরালা বেশ। নির্ভয়ে থাকতে পারবি।

ফারুক বসে পড়ল পাশে। সিগ্রেট বের করে সমুর ঠোঁটে গুঁজে দিল সে। তারপর কপালে হাত রেখে বলল, এখনও জ্বর আছে। কমে যাবে। ট্যাবলেট কটা খেয়েছিস?

খেয়েছি। ফারু, পান্নাদা আসবে বলছিল যে!

কে জানে কখন আসবে! আমাকে এক্ষুণি সাইকেলের দোকানে যেতে হবে। না থাকলে পুলিশ সন্দেহ করতে পারে। তুই থাক্, নাজমা তো রইল।

ফারুক, নাজমা সব জানে?

জানে—অন্যভাবে।

অন্যভাবে মানে?

ওকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে, তুই পলিটিকাল পার্টির লোক। বিপ্লবী-টিপ্লবী আর কী!

ও খুকি নয়। মডার্ণ গার্ল। এডুকেশান আছে।

তাতে কী? ওকে বুঝিয়ে দিয়েছি—তোর পার্টি ডাকাতি-টাকাতি করে বিপ্লবের জন্যে টাকা পয়সা যোগাড় করছে। কাগজে এমন খবর বেরোয় না? নাজমা খবরের কাগজের পোকা। সেজন্যেই তো তুই ওর চোখে হিরো। ফারুক হাসল।

সমুও হাসল।...ফারুক। আমরা শালা কী রে। ধেৎ!

সেন্টিমেণ্ট এসে গেল অমনি? সমু, এবার আমরা নাকি লাখটাকার মাল হাতিয়েছি। রাজা হয়ে যাবি মাইরি! টেট্রি বর্ডারের দিকে এতক্ষণ পৌঁছে গেছে।

সমু চুপ করে থাকল। ফারুকের মুখে সে নির্বুদ্ধিতার ছায়াটা খুঁটিয়ে দেখছিল। ফারুক কি রাজা হবার জন্যেই পান্না বোসের সাগরেদ হয়েছে? এই ফারুকের পিছনের ইতিহাস কিছু কিছু জানে সে। ছেলেবেলায় ওর বাবা মারা গেলে মা ফের বিয়ে করেছিল এক বড় ঘরের খান্দানী মানুষকে। ফারুককে সে-ভদ্রলোক লেখাপড়া শিখতে দিয়েছিলেন। কিন্তু ডানপিটে বদমাস ছেলেটার পড়াশোনায় একদম মন নেই। শুধু মারামারি আর ঝামেলা করে বেড়ায় এখানে ওখানে। সৎবাপের খাতিরে লোকে বেশি কিছু করতে পারতনা—বড়জোর ওঁর কাছে নালিশ-অনুযোগ মাত্র। শেষ অব্দি স্কুল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হল ফারুককে। অংকের মাষ্টারকে চড় মেরেছিল। ওর সৎবাপ মৈনুদ্দিন খোন্দকার হাল ছেড়ে দিলেন। পাগলা ষাঁড়ের মতো ঘুরে বেড়ায় ফারুক। ততদিনে কিছু সঙ্গীও জুটে গেছে তার। ধর্ষণ, ছিনতাই, রাহাজানি—ছোট থেকে ক্রমে বড় কাজে হাত পাকাচ্ছে সে। খোন্দকার সৎছেলের জন্যে মাথা ভাঙতেন। মা কান্নাকাটি করত। তোর কিসের অভাব? কেন তুই এসব করছিস?... হয়তো মঘার কথাই সত্য,—এ একটা রক্তের নেশা। আর চিনু যে বলে—পৃথিবীতে 'এভিল' বা মন্দ বলে কিছু থাকবে না, এ হতে পারে না এবং 'এভিল' না থাকলে পৃথিবীকে বাতিল করা ভালো—

সেও হয়তো সত্যি। (চিনুকে তাই পান্নাদা 'পাদ্রীবাবা' বলে ডাকে) যাই হোক, খোন্দকার সম্ভবত ফারুকের দূষিত স্পর্শ থেকে নিজের ছেলেমেয়ে এবং পরিবারকে রক্ষা করতেই পূর্ববাংলা চলে গেলেন একদিন। সম্পত্তি বিনিময় করেই গেলেন। দেখা গেল, বেশ কিছু জমি তিনি ফারুকের জন্যে রেখেও গেছেন। ফারুক দিনেদিনে তা বিক্রি করে স্ফূর্তি ওড়াল। তারপর তার সামনে অন্ধকার দুনিয়া।

পাকাপাকিভাবে লাইনে এসে গেল কারুক। হাতেম চৌধুরীর রাজনীতিতে নেশা আছে। ফারুক আর তার দলবলকে আগের দিনের মঘার মতনই কাজে লাগান তিনি। পুলিশের ঝক্কিও সামলান। ফারুক বুক ফুলিয়ে বেড়ায়। পঁচিশ বছরের উদ্ধত স্বাস্থ্য। পরিপাটি চুল আঁচড়ে আলিগড়ি পাঞ্জাবী-পাজামা-চপ্পল-পরে বেড়াতে বেরোলে বরং তাকে মনে হয় কোন অভিজাত ঘরের সন্তান। অথচ দরকার হলে নীলচে আঁটো প্যান্ট, ফুটকিকাটা ক্ষুদে সার্ট, ছুঁচলো জুতো—সে একেলে মস্তান এবং শুধু মস্তান নয়, সেরা লড়ুয়ে। পাইপগানে সে সিদ্ধহস্ত। রিভলভারে সব্যসাচী। আরও কত তার হিম্মত।

কিন্তু একটা কিছু না করলে ভালো দ্যাখায় না। একটা মুখোস তার দরকার হয়েছিল। মৌরীগ্রাম ষ্টেশন বাজারে সাইকেল মেরামতের দোকান খুলেছিল সে। পান্না বোসেরই পরামর্শে। পান্না বোস এ রেলপথের দুপাশ থেকে কতদূর অব্দি এমনি মণিমানিক্য কুড়িয়ে গলার মালা গেঁথেছে, সংখ্যা নেই। পান্না বোস বড় রহস্যময় মানুষ। তার কথায় আগুনে ঝাঁপ দিলে সুখ মেলে। সমু তো জানেই তা।

হঠাৎ সমু বলল, হিকির খবর কী রে?

ফারুক নিঃশব্দে সিগ্রেট টানছিল। মুখ তুলে বলল, বেটাচ্ছেলে এখন কলকাতায় গিয়ে জিরোচ্ছে। পান্নাদা বলছিল, তাক লেগে গেছে হিকির। এমন ফাইট শালা এ জন্মেও দেখেনি। আরে

বাবা, ও তো আসানসোলের ওদিকে সামান্য দুচারটে ছোটখাট কাজ করেই নাম কিনেছিল। ওর চেহারাটা আসলে ওর কাল, বুঝলি সমু? তুই ব্যাটা বড়জোর কলকাতার গড়ের মাঠ নয়তো সায়েবসুবোদের পাড়ায় গেম দিতে পারিস—কোন ঝুঁকি নেই। বাইরে বেরোলেই তোর মুসকিল! কাকের দলে বক এলেই হয়েছে!

সমু বলল, পান্নাদা ওকে নিল কেন?

ফারুক বলল, সেটাই তো ভেঙে বলছে না গুরুজী। মতলব কিছু একটা আছে—জানিস? ঠিক টের পাওয়া যাবে সময়মতো। ...আমি উঠিরে!

উঠবি?

হ্যাঁ। দেখি, তোর পায়ের অবস্থা?

থাক।...সমু বাধা দিল। একটু হাসল।...আমি নিজেও দেখিনি।

ফারুক একটু চুপ করে কী ভেবে বলল, অপারেশনের ব্যবস্থা এখনও হল না—আমার খুব খারাপ লাগছে মাইরি! এদিকে তেমন ডাক্তার তো নেই। যাও বা আছে, রাজী করানো গেল না। আমি কাল রাত্তিরে পান্নাদাকে বললুম, বরং কলকাতায় নিয়ে যান শিগগির। নয়তো কাছাকাছি কোন টাউন-ফাউনে। নারসিং হোম তো অনেক আছে! পান্নাদা—শালা পান্নাদাটা কী মানুষ! বললে, উঁহু—এখন আর অসম্ভব। ষ্টেশনের কাণ্ডের পর সব রটে গেছে পুলিশমহলে। এখন সবজায়গায় ওরা ওঁৎ পেতে থাকবে। এদিকে টেট্টির ট্রাকটাও নেই। ফিরে আসুক, তখন...

সমু ক্ষুব্ধমুখে বলল, আর বুঝি গাড়িফাড়ি থাকতে নেই?

ফারুক গম্ভীর হয়ে বলল, গাড়ি যেতে তো সড়ক লাগে। সব সড়কে ওরা কড়া নজর রাখবে। গাড়ি চেক না করে ছাড়বে না। পান্নাদা ঠিকই ধরেছে রে।

তাহলে আমি পচে মরব এখানে? মঘা হয়ে যাব?

ফারুক ঝুঁকে এল ওর দিকে। সমু, তুই কেঁদে ফেললি।

না। রাগলে আমার চোখে জল আসে।

হেসে ফেলল ফারুক।...আরে বাবা, তুই তো আমাদের মধ্যেই আছিস। তোকে তো কেউ মাঠেজঙ্গলে ফেলে রাখেনি। ছাখ, হয়তো আজই একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

হাতি হবে। সমু বিকৃত মুখে বলল। আমি শালা মরে যাবে —ঘা বিষিয়েই মরব। তখন তোরা ইন্দার মতো আমার মুণ্ডুট কেটে...

ফারুক ওর পাশে বসে মুখে হাত চাপা দিল। বালাই ষাট এ বাঙালকে আর পারা গেল না।

হয়েছে। ঘটিগিরি ফলাসনে। বাঙাল বলেই এত সহ্য করছি ঘটি হলে এতক্ষণ চেঁচিয়ে সাতকাণ্ড করতিস। আমার জান আছে।

সমু!

বল্।

আমি উঠি। নাজমা এক্ষুনি এসে পড়বে। ভাবিসনে।

সমু চুপ করে থাকল।

ফারুক দাঁড়াল। চাপা গলায় এবং মুচকি হেসে বলল, নাজমা কাছে কালকের ব্যাপার কিছু কিছু শুনলুম। হ্যাঁরে, দেবী ব্যানার্জি মেয়ে তোর ইয়ে জানতুম না তো। সত্যি নাকি?

কে, সুশি?

সুশি নাম বুঝি?

হ্যাঁ, সুশি আমাকে এক সময় ভারি পটাত। পরে ভড়কে গেল

কী অসভ্য রে বাবা! চলি।

একটু পরেই নাজমা এল। কাঁধে একটা কিটব্যাগ। একট ফ্লাস্ক। সাবধানে দরজা ঠেলে ঢুকল। হাসল।...একটু দেরী হ

আসতে। কারা সব বসে ছিল বাবার ওখানে। এদিকে খিড়কির বাইরেও জেলেরা মাছ ধরবে বলে বসে রয়েছে। খানিক অপেক্ষা করেও কিছু হল না। অগত্যা বাঁশবন ঘুরে…

সমু হাত তুলেছিল। থামিয়ে দিতে। তারপর বলল, আজ শাড়ি পরেছেন দেখছি।

নিজের পোশাকের দিকে তাকিয়ে নাজমা বলল। শাড়িই তো পরি। বলে সে কিটব্যাগ থেকে যা বের করল, তা দেখে সমু আবক। সেদ্ধ ডিম, হালুয়া, প্রকাণ্ড দুটো পরটা।

সমু বলল, আরে, অতসব খাবে কে? আমার তো জ্বর।

নাজমা হাসল।…আপনি বিপ্লবী। আপনার শক্তি দরকার। না খেলে চলে?

সমু ভ্রূ কুঁচকে বলল, বিপ্লবীদের আপনি পছন্দ করেন বুঝি? কেন?

করি। কেন, তা জানি নে। হয়তো এ দুনিয়াটা আমার পছন্দ নয়—ওরা দুনিয়াটা বদলাবে—তাই। নিন, একটু উঠতে চেষ্টা করুন।

আপনি তো ভারি চমৎকার কথা বলতে পারেন! সুশিটা পারে না।

নাজমা নতমুখে প্লেটগুলো রাখতে থাকল। কথা বলল না।

কিন্তু আপনি তো জোতদারের মেয়ে। বিপ্লব এলে আপনি কী করবেন?

ভেবে দেখিনি। কই, হাত লাগান।

হুঁ।…সমু টের পেল, সে ভীষণ ক্ষুধার্ত। গোটা ডিমটা মুখে পুরে দিল সে।

নাজমা বলল, সুশিকে খবর দিতে হলে বলবেন। অবশ্য, বলা যায় না—আজ এসে পড়তেও পারে এখানে। এলে নিয়ে আসব?

সুশিকে বিশ্বাস করা ঠিক হবে—তাই না?

নাজমা হেসে ফেলল।···সে তো আপনি জানেন ভালো। আমার সঙ্গে ওর নতুন আলাপ।

সমু গম্ভীর হয়ে বলল, ও বড্ড চপলপ্রকৃতির মেয়ে।

তাহলে বলব না।

কিছুক্ষণ নিঃশব্দে খেল সমু। জল খেল। তারপর নাজমা চায়ের ফ্লাসটা খুলে চা ঢেলে দিল। সমু চায়ে চুমুক দিয়ে বলল, না। বলতে পারেন। সুশি কিছুদিন আগেও রাজনীতি করত-টরত।

তাই নাকি? আমি কিন্তু কিছু করি-টরি না। বাবা করেন—তবে—সে সব ইলেকশানের ব্যাপার। নাজমার কথায় কোন কাপট্য নেই মনে হচ্ছিল সমুর।

সমু বলল, আচ্ছা নাজমা—ধরুন, আমি সত্যি সত্যি বিপ্লবী··· হঠাৎ থেমে গেল সে। চায়ের কাপটা রেখে সিগ্রেট ধরাল।

নাজমা বলল, কী হল?

কিছু না। আচ্ছা নাজমা, মঘা ডাকাতকে আপনার ভয় করে না?

উঁহু। কেন বলুন তো?

আমাকে ভয় করে? সত্যি বলবেন কিন্তু।

করে।

কেন করে?

দুনিয়া বদলানোর শক্তি আপনাদের আছে—তাই। মঘা তো নিতান্ত ডাকাত।

সমুর ভিতরটা তেঁতো লাগল হঠাৎ। উদ্দেশ্যহীন মনে হল নিজের জীবনটা—এ মুহূর্তে যেন খোঁজ খোঁজ সাড়া পড়ে গেল ভিতরে। অস্তিত্বব্যাপী ঝড় উঠল হঠাৎ। সে চুল খামচে ধরল। পান্না বোস বলে, নতুন সময়ের চাহিদাও নতুন। আমার যিনি ওস্তাদ, তাঁর গ্যাঙে ছিল সব অশিক্ষিত শুওরবাচ্চারা—বোকার হদ্দ যেমন, তেমনি গোঁয়ার। আমার গ্যাঙে নতুন রিক্রুট।

প্রত্যেকটি কমবয়সী—আর এজুকেটেড। তাই পান্নাবোস এখনও গেমে মার খায় না।…

কিন্তু কেন? কী উদ্দেশ্যে সমু-চিনু-ইনদারা পাড়ার রক ছেড়ে পান্না বোসের পিছনে গিয়ে দাঁড়াল? রক্ত কিছু চেয়েছিল বলে? সময়ের ডাইনীর ডাকে?

তাহলে তো অন্য বন্ধুদের মতো সত্যিসত্যি বিপ্লবী হয়ে উঠত—রাজনীতিতে ভেসে যেতে চাইত। যেমন করেছে তাপস, হিরণ, চিত্তপ্রিয়রা।

সমুরা পান্না বোসের হুকুমে ওয়াগন ভাঙতে লড়াই ছায়, রেলের কামরায় ডাকাতিতে পিস্তল উঁচিয়ে দাঁড়ায়, হাইওয়েতে ট্রাক থামিয়ে মাল হাতাতে সাহায্য করে। তারপর আসে টাকা। পান্না বোস হাত উবুড় করে। একগাদা নোট নিয়ে বুক ফুলিয়ে হাঁটে ওরা। মদ খায়। জুয়ো খেলে। পোষাক বানায়। এদিকে যার-যার গরীব সংসার—সরস হয়ে ওঠে কিছুদিনের জন্যে। ফের আবার শুকিয়ে যায় এবং ফাটল ধরে। তখন ফের…

চিনুর দাদার চাকরী গিয়েছিল। মা বাবা ভাইবোন আর দাদাবৌদির কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে বড় সংসার। চিনুর দাদা এখন ব্যবসা করছে চিনুর টাকায়। মোটামুটি চলছে।

ইনদার মাথার ওপর কেউ নেই। ওরা তিন ভাইবোনে কলেজে পড়ে। আড়াইশো টাকায় ঘর ভাড়া নিয়েছিল ইনদা। সে ঘরে রেডিওগ্রাম সোফাসেট খাট—কত কী এল। আজ ইনদার মুণ্ডু-বিহীন ধড়টার চাপে তার সাজানো সংসার পিষে যাচ্ছে এবার। গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে।

আর সমুর? সমুর বিধবা মা ঘরে একা। পূর্ববাংলার দাঙ্গায় সব খুইয়ে এখানে এসেছিল একমাত্র জীবিত দুজন মানুষ। মা সেলাইয়ের কাজ করে সমুকে মানুষ করছিল। সমুটা অন্যরকম মানুষ হল। কেন হল অন্য রকম মানুষ? সময়ের ডাইনীর বাঁশী শুনেছিল? রক্ত কিছু চেয়েছিল বলে?

সমু মুখ নামিয়ে নাজমার একটা বাহুর দিকে চোখ রাখল। সে মুহূর্তে বড় ঝড় চলছে। ওই ঝকঝকে সুন্দর নিটোল মেয়ে-বাহুটা দেখতে দেখতে তার ধারণা হচ্ছে—হ্যাঁ, কোথাও এ পৃথিবীতে রয়ে গেছে পরিপূর্ণ সৌন্দর্য, চরম সুখ, অফুরন্ত শান্তি, আর বারবার তৃষ্ণা মেটাতে পারে এমন সুমিষ্ট কোন নির্ঝর। যৌনতার বাইরে এখনও হয়তো বা অপেক্ষা করে আছে প্রেম, বিনাশের বাইরে সৃষ্টির হাত আছে কোথাও উদ্যত। অথচ তার ভুল হয়। তার ভুল হয়েছে।

নাজমা বলল, উঠি।

আমাকে ভয় করেন বলছিলেন, তাই পালাচ্ছেন না তো?

না, না। এমনি।

একটু বসুন।

বাবা কিন্তু জানেন না যে আমিই আপনাকে খাবার দিতে এসেছি। ফারুদা আমাকে বলেছিল—তাই···

আপনার মা কিছু বলবেন না?

মা? নাজমা হাসল। মা নিতান্ত গেঁয়ো মানুষ। সবতাতেই হ্যাঁ। তবে মেয়ের কাণ্ড স্বামীর কানে তুলবেন না। সে জ্ঞান আছে। আর আমাদের যে চাকরটাকে বাবা বলে রেখেছেন, তাকে আমি ম্যানেজ করেছি।

বাঃ! কিন্তু কেন মিছেমিছি এ রিস্ক নিলেন—বাবাকে লুকিয়ে?

নাজমা নাকটা অকারণ মুছে বলল, আমার কৌতূহল ছিল বড্ড। আপনাদের কথা কাগজে পড়েছিলুম, দেখিনি তো কখনো।

দেখলেন? কী মনে হল?

বলা মুসকিল।

আচ্ছা, আমি উঠি। আর দেখুন, বইটই পড়বেন?

কী বই?

উপন্যাস-টুপন্যাস আমার ভাল্লাগো না। তেমন কিছু নেই। তবে—শিকার বা স্পোর্টস···

ইংরেজী ?

ইংরেজী-বাংলা দুইই আছে। পাঠাচ্ছি।

বাংলাটা পাঠাবেন। ইংরেজীতে নার্ভের চাপ পড়বে।...সমু হাসতে লাগল।

নাজমা চলে গেল।

ফের অগাধ নীরবতা। ফের পাখির ডাক। আমমুকুলের গন্ধ। বাইরে ওই হিরন্ময় সকাল এখন সমুর জন্যে নতুন কিছু নিয়ে অপেক্ষা করছে যেন। যেতে পারলে সত্যিসত্যি দুনিয়া বদলাত। কিন্তু পায়ে কষ্ট।

সে কি মঘা হয়ে যাবে ? খুব ভয়ে ভয়ে মঘার চেহারাটা স্মরণ করল সে। দেখল, একদিকে কঠিন নিষ্ঠুরতম অন্ধতা, অন্যদিকে সুতীব্র দৃষ্টিবত্তা তার সামনে এসে দাঁড়াল। সমু চোখ বুজল। এতক্ষণে মায়ের কথা মনে পড়ল তার।

॥ পাঁচ ॥

জংশনের রেলহাসপাতাল থেকে ফার্ষ্ট এড দিয়েই ছেড়েছে মৌরীগ্রামের বড়বাবুকে। শক্তিব্রত কোয়াটারে শুয়ে ছিলেন চুপচাপ। কষ্টটা মনেরই বেশি। অন্ধকারে ভূতের খেলা হয়ে গেছে আর কী!...এই ভেবে হাসবার চেষ্টা করছিলেন। মাঝে-মাঝে বিড়বিড় করছিলেন—সেটা রাগের দরুণ।...হুঁঃ, সব মুরোদ জানা গেছে। যাও না, লড়াই দাও ঠিকঠিক জায়গায়। ওই যে যারা বোমা ফাটাচ্ছে, মানুষের গলা কাটছে, সেখানে গিয়ে হাত চালাও না! দেখি, কেমন হাতের জোর।

বাবা, ও বাবা! কিচেন থেকে রেখা সস্নেহে ডাকল।

হুঁ!

কিছু বলছ নাকি?

না।

কিন্তু ফের সুরু হল।...আরে কী কাণ্ড! আমাদের নিরঞ্জনটার পেটেপেটে এত সব ছিল! এ্যাঁ! না জেনে কত ভালোভালো কথা বলেছি, কত আশীর্বাদ করেছি! সেই নিরঞ্জন...উঃ! রেখা, চা দে।

কী বলছ?

চা দে।

দিচ্ছি, বাবা।

চা করে আমার কাছে এসে বস্ মা।

ব্যথা করছে?

হুঁ।

শক্তিব্রত শুয়ে পা নাচাতে থাকলেন। একটু পরেই রেখা চা

নিয়ে এল। পাশে বসে বুকে হাত রাখল সে।···সেই মালিশটা করে দেব?

থাক।···শক্তিব্রত কাত হয়ে চায়ের কাপ তুলে চুমুক দিলেন। তারপর সকৌতুকে ফের বললেন, হ্যাঁ রে, নিরঞ্জনের বউ কিছু বলছে-টলছে?

রেখা ভ্রূ কুঁচকে বলল, কী বলবে?

আমিই ওকে ধরিয়ে দিয়েছি বলছে না তো?

না। তা কেন বলবে? রেখা চাপা গলায় বলতে থাকল।··· জানো বাবা, যখন মারামারি হচ্ছিল না—তখন ছোটবাবু বউদিকে যা মার না মেরেছে! ইস্, কালসিটে দাগ ফেলে দিয়েছে। বলেছে, তুই যত নষ্টের গোড়া।···তারপর···

শক্তিব্রত সোজা হয়ে বললেন, খানকির বাচ্চা!

হ্যাঁ, খানকির বাচ্চা।···রেখা রুদ্ধশ্বাসে আওড়াল।···তেমনি বেশ হয়েছে, ওর হাতে হাতকড়া পড়েছে। যা ঠ্যাঙানি দেবে টের পাবে'খন।

ওর বউ কী করছে রে? চেষ্টাফেষ্টা করছে কিছু?

কিসের?

নিরঞ্জনকে ছাড়াবার।

কে জানে!·· রেখা ঠোঁট কুঁচকে বলল।···আমাকে ডাকছিল। আমি যাইনি।

যাস্‌নি কেন? যাস্। আহা, মেয়েটা বড় ভালরে!···হঠাৎ শক্তিব্রত কণ্ঠস্বর নামিয়ে বললেন, তুই জানিস রেখু? আসলে কে এসব ধরিয়ে দিয়েছে? মনো রে, আমাদের টি সি মনো।

রেখা চোখ বড় করে বলল, মনোদা?···পরক্ষণে, ওই যাঃ, ডাল, ধরে গেছে বলে দৌড়ে কিচেনে চলে চলে।

শক্তিব্রত খুব তাড়াতাড়ি চাটা গিলে নিলেন। তারপর নতুন সঙ্গী ছড়িটা টেনে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। হাঁটতে সামান্য কষ্ট

হচ্ছে—তবে অনেক পোড় খাওয়া শরীর এটুকু সয়। রেখাকে এড়িয়ে খিড়কির দিকে বেরোলেন। খালি পায়ে বেরোলেন।

নিরঞ্জনের কোয়াটারে গিয়ে কড়া নাড়লেন চুপিচুপি।

দরজা খুলেই অনু ঘোমটা দিল এবং পিছিয়ে গেল।

শক্তিব্রত বললেন, ক্ষমতা ছিল না বলে আসতে পারিনি বউমা। কিছু মনে করোনা।

অনু আস্তে আস্তে বলল, ভিতরে আসুন।

উঁচু বারান্দায় উঠতে কষ্ট হচ্ছিল শক্তিব্রতর—অনু নিঃসংকোচে হাত ধরল। শক্তিব্রত মনেমনে গলে গেলেন। ভিতরে গিয়ে একটা মোড়ায় বসলেন। দেয়াল এবং আসবাবপত্র দেখতে থাকলেন।

অনু বলল, এত শিগগির চলাফেরা করা ঠিক হচ্ছে না আপনার। আমারই যাওয়া উচিত ছিল। যেতুম।···

হাত তুলে থামিয়ে দিলেন শক্তিব্রত।···তোমারও তো কম লাঞ্ছনা হয়নি মিছেমিছি।···একটু হেসে ফের বললেন, একদল মানুষ আছে, যারা মার খেতে জন্মায়। আমরা সেই দলে। যাক্‌গে, নিরঞ্জনের জামিনটামিনের কী হল?

অনু মুখ ফিরিয়ে বলল, আমি জানিনে। ওর ভাইদের খবর দিয়েছি। তারা সব করছে-টরছে হয়তো। অবশ্যি, এখানে কেউ আসেনি। আর, এখানে আসবারও কোন কারণ নেই। আপনি বোধ হয় জানেন না, ও বাড়ির অমতে বিয়ে করেছিল।

অ। শক্তিব্রত ভাবিত হলেন।

অনু উঠল হঠাৎ।···বসুন, চা করে আনি।

শক্তিব্রত মাথা দোলালেন।···এইমাত্র—এক্ষুনি চা খেয়েই বেরিয়েছি। থাক্‌। তাহলে তোমার তো বড্ড অসুবিধে বউমা। একা এই বদমাসের জায়গায়—স্ত্রীলোক—তাছাড়া···

অনু বলল, আপনারা তো আছেন।

তা আছি।···শক্তিব্রত হঠাৎ বিছানার পাশে টুলের দিকে হাত

বাড়ালেন। টুলের ওপর কিছু বই। একটা তুলে নিয়ে বললেন, কে পড়ে? তুমি? বাঃ!···এ যে দেখছি নভেল! লেখক কে? শরৎবাবু নয় দেখছি। নামও শুনিনি। ছাখো বউমা, আজ-কালকার নভেল তুমি বরং পড়োনা। যাচ্ছেতাই, যাচ্ছেতাই! অপাঠ্য অশ্লীল সব কেচ্ছাকাহিনী। ওই পড়েই তো লোকেরা গোল্লায় যাচ্ছে!

অনু জানালার বাইরে আকাশ দেখছিল। কোন জবাব দিল না।

শক্তিব্রত হতাশ এবং ক্রুদ্ধ হলেন মনেমনে। কিন্তু ভাব গোপন করে বললেন, একটা কথা বলছিলুম। যদি কিছু মনে না করো মা—তাহলে···

অনু হেসে মুখ ফেরাল।···না, না। বলুন।

টাকাপয়সার কোন অসুবিধে হচ্ছেনা তো তোমার? নিরঞ্জন ভীষণ খরুচে লোক। আমি তো জানি।

অনু মুখ নামিয়ে বলল, খরুচে—মানে বাড়িতে টাকা পাঠাতে হয়। এদিকে বাড়ির লোক দুবেলা আমার মাথা না খেয়ে জল-গ্রহণ করে না—এমনকি এসে ওর বউকে কৃতার্থও করে গেল না কোনদিন। অথচ দিব্যি টাকাপয়সা নেওয়াটা বেশ চলে। না—আমি দোষ দিচ্ছিনে। যাদের বাড়ির ছেলে, তারা ছেলের সঙ্গে কী সম্পর্ক রাখল না রাখল, আমার তাতে মাথাব্যথা নেই। তারা ছেলেকে লেখাপড়া শিখিয়েছে—মানুষ করেছে। খরচা করেছে। সে খরচা সুদেআসলে তুলে নিলে দোষ দেব কেন?

শক্তিব্রত বললেন, তাই বটে। তা বউমা, বলছিলুম কী—ইয়ে—টাকাপয়সা লাগবে এখন? দেব কিছু? লজ্জাসংকোচ করো না মা! রেখার দিদি বেঁচে থাকলে এতদিনে তোমার মতই হত। তাকে যেমন বলতুম, তেমনি তোমাকেও বলছি। দেব কিছু?

অনু মুখ ফেরাল। টাকাপয়সা! আর মাত্র দুটো টাকা সম্বল। নিরঞ্জন মাসের দশটা দিন যেতে না যেতেই টাকার জন্যে হাত

বাড়াত এখানেওখানে। কর্তব্যবান পুত্রের ব্যাপারই আলাদা। কিন্তু এতদিনে তো সত্যিসত্যি জানা গেল, পান্নাবোসরাই তাকে হাততোলা কিছু কিছু টাকা দিত মাত্র। টাকার লোভে মানুষকে কি এমনি করে প্রাণ নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে হয়?

অপ্রস্তুত শক্তিব্রত উঠে দাঁড়ালেন। পকেটে কিছু টাকা ছিল। সকালে রেখা বাজার থেকে একটা একশোটাকার নোট ভাঙিয়ে এনেছিল। শক্তিব্রত আন্দাজে কয়েকটা নোট তুলে অনুর হাতে গুঁজে দিলেন। তারপর পিছু না ফিরে চলে এলেন।

অনু মুঠোয় টাকাগুলো ধরে নিঃশব্দে কাঁদতে লাগল।

বলুন নিরঞ্জনবাবু!

নিরঞ্জন ফ্যালফ্যাল করে তাকাল। কোথায় বসে আছে সে? এই লোকগুলোই বা কে? প্রথম কয়েকমুহূর্ত তার মনে হল স্বপ্ন দেখছে। সামনের টেবিলটার দিকে সে চোখ ফেরাল। এখানে ওখানে কালির ছোপলাগা বাদামীরঙের টেবিলে কয়েকটা ফাইল-পত্তর, হালকা মলাট দেওয়া পুরু খাতা, কলমদান, পেন্সিল, একটা কাগজকাটা ছুরি, পিনকুশন, দুটো পেপারওয়েট আর একটা বেটন। নিরঞ্জন চেষ্টা করেও এই টেবিলের জিনিষগুলো থেকে মনকে তুলে নিতে পারলনা। সে অসহায় হয়ে দেখল, যাকিছু ভাবতে যাচ্ছে, তাই জড়িয়ে যাচ্ছে ওখানটায়। তখন সে নিজের আঙুলগুলো দেখতে থাকল। একটা আংটি ছিল কি? ছিল। বিয়ের আংটি। সেটা কে নিল? সে অস্ফুটকণ্ঠে বলল, আমার আংটিটা···

আছে। ভাববেন না।···সামনের গুঁফো লোকটি বলল।···এখন দয়া করে আমার কথার জবাবটা দিতে চেষ্টা করুন, স্যার। আপনাকে তো বোঝানোর কিছু নেই—ভদ্রলোকের ছেলে, লেখা-পড়া শিখেছেন, রেসপনসিবল্ পোস্টে চাকরীও করছিলেন। ভেবে দেখুন তো, সরকার এবং জনসাধারণ কত বিরাট দায়িত্ব আপনার

হাতে দিয়েছিলেন। শুধু পাবলিক প্রপারটি বলে কথা নয়, জনগণের নিরাপত্তাও এতে জড়িত। এবং···

নিরঞ্জন তখন ভাবছে, আরে কী অবাক, বিয়েও তার হয়েছিল। অনুরাধা তার বউ! বিয়ের আগে অল্পস্বল্প প্রেমভালবাসাও হয়েছিল। তখন সদ্য প্রবেশন পিরিয়ড শেষ করে চুঁচড়োতে সে ছোটবাবু হয়ে জয়েন করেছে। ষ্টেশনের খুব কাছেই অনুদের বাড়ি। অনু স্কুল ফাইনাল পাশ করে চাকরী খুঁজছে। প্রতিদিন কলকাতা যাওয়া আসা করে। গেটে দাঁড়িয়ে টিকিট নেয় নিরঞ্জন—গায়ে রেলকোট, প্যান্ট, উস্কোখুস্কো চুল, সামান্য গোঁফ। একদিন হল কী, প্রতিদিনের সেই বেঁটে আর ঈষৎ মুটকি মেয়েটি—যার পরনের ফিকে নীল অরগ্যানডির সাড়িটা নিরঞ্জনের খুবই চেনা হয়ে গেছে, রাতের আপ ট্রেন দশমিনিট লেটে পৌঁছেছে, সবার শেষে তাকে দেখা গেল। ওজনকরার যন্ত্রটা আর ফায়ার লেখা ঝুলন্ত বালতি গুলোর মাঝখানে দাঁড়িয়ে সে উসখুস করছিল। মুচকি হেসে এগিয়ে নিরঞ্জন বলেছিল, টিকিটটা দিন। অনু ফিক করে হেসে ফেলেছিল।···আজ কাটিনি। কাটা হয়নি। পয়সা ছিল না, তাই।···নিরঞ্জনের কেমন দুঃখ লেগেছিল হঠাৎ। আহা বেচারা! চাকরীবাকরীর যা বাজার—কে আশা দিয়ে ঘোরাচ্ছে, হয়তো মিছেমিছিই ঘোরাচ্ছে—মেয়ে কিনা! এবং নিরঞ্জনের সেই সহানুভূতি থেকেই সম্ভবত প্রেমভালবাসার দামাল সন্তান ভ্রূণস্থ হল। দিনে দিনে কালকেতুর মত বাড়তে থাকল। ওদিকে তার বউ ঠিক হয়ে আছে কবে থেকে। বাড়ির দায়িত্ববান ছেলে, রোজগেরে—ভালো বউ, নগদে জিনিসপত্রে নহাজার টাকার পাকা ব্যবস্থা শেষ। নিরঞ্জন ফাঁপরে পড়েছিল। যে-বাবা এবং মা একদা বেকার গ্রাজুয়েট নিরঞ্জনকে খেতে বসে খাওয়ার খোঁটা দিয়েছিলেন বলে সে মনের দুঃখে বেশ কিছুকাল নিরুদ্দিষ্ট হয়েছিল এবং যদিও তার দরুণ কোন ফোটোসহ বিজ্ঞাপনও বেরোয়নি কাগজে—সে চাকরী পাবার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির কথা ভেবেছে।

প্রথম মাইনে পেয়েই বাবা মার কাপড় চোপড়, ভাইবোনদের জন্যে সন্দেশের হাঁড়ি নিয়ে বাড়ি ফিরেছে। সে কি কান্নাকাটি!···তারপর তিনমাস যেতে না যেতে বিয়ের যোগাড়। বাবা বললেন, সব কর্তব্যই করেছি—এই একটা বড় কর্তব্য মাত্র বাকি আছে। এটা যথার্থ বাবাদের সর্বশেষ দায়িত্ব। সমাজনীতি তো বটেই, পুরুষ-পরম্পরা সুরক্ষিত পিতৃবিবেকের সন্তোষার্থও···বেশ গুরুগম্ভীর বাংলা বলেন ম্যাকলিয়ড এ্যাণ্ড রজার্সের প্রাক্তন কেরাণী ওই বৃদ্ধ ভদ্রলোক। সে আমলে খ্রীষ্টমাসের ছুটিতে বাড়ি আসবার সময় কেক আনলে কী হবে, স্বদেশিয়ানাও কম ছিল না। ধর্ম এবং জাতিবর্ণগোত্র ব্যাপারেও দারুণ গোঁড়া। পুরো সনাতনপন্থী ষ্ট্রাকচার। একটু বঙ্কিম-বঙ্কিম ঢঙ—বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে ভারি মানিয়ে যেত।···

···উপন্যাস! উপন্যাস অনুর নিদ্রাহরণ চিন্তামোহন। গাদা-গাদা পড়ে। তখনও পড়ত। সব দিনই হাতে বই। ওইটেই হয়েছে জ্বালা। অনু উপন্যাসের জগতেই আটকে গেছে। বাস্তব জগতটা তার একটুও যেন দেখা নেই। জানা নেই। অথচ একটা অনাথ ত্রিকুলবিহীনা মামাআশ্রিতা মেয়ের পক্ষে উল্টোটা হওয়া উচিত ছিল। তা অনু চাকরী পায়নি। পাচ্ছিল না। তখন নিম্নবিত্ত বাঙালী ঘরে অকারণ বোঝা নামাবার জন্যে যা সব ঘটে। খোঁজ, বর খোঁজ। প্রায় গরু খোঁজার সামিল। কানাখোঁড়ার দিকেই তৎপরতা বেশি প্রকাশ পায়।···

নিরঞ্জনের ঠোঁটে হাসি ফুটে উঠল।

কই, বলুন নিরঞ্জন বাবু। সামান্য একটা ব্যাপার। অত ভাববার কী আছে? আপনার গায়ে কাঁটার আঁচড়টি লাগবে না। ভেবে দেখুন দিল্লী থেকে কলকাতা—বড় ছোট দু'-দুটো সরকার আপনাকে রক্ষার দায়িত্ব নিচ্ছে। বলুন!

নিরঞ্জন আনমনে বলল, হ্যাঁ, বলছি।

···তারপর অনুর বিয়েও ওদিকে কতকটা ঠিকঠাক। তার মামা

রেজেষ্ট্রি অপিসের এক মুহুরীর সাথে সম্বন্ধ ঠিক করে ফেলেছে। দোজবর। মাথায় টাক, কুঁজো হয়ে হাঁটে—কারণ এতকাল কুঁজো হয়ে বসে দলিল লিখে-লিখে ওই দশা তার। অনুই হেসেহেসে জানাল। শেষে কাঁদল। খুব সহজে কাঁদতে পারে বা হাসতে—ওই অনু। এটা উপন্যাসপ্রিয় মেয়েদের হয়তো স্বভাব। তারপর তো সে এক অনাছিষ্টি কাণ্ড। গ্রীষ্মের দুপুরবেলা কোয়াটারে জিরোতে গেছে নিরঞ্জন—অনু এসে হাজির। প্রেমভালবাসার চাপটা বেড়ে গিয়ে একটা বিস্ফোরণ ঘটাল।···আচ্ছা, সেই দুপুরে অনুকে কেন এত ভাললেগেছিল? ওর সেই দেহটা কোথায় গেল? তারপর থেকে কি অনু সংরক্ষিত তহবিলের মতো ওটা তার হাতের আড়ালে রেখে দিয়েছে—সে খরুচে প্রকৃতির লোক বলে? হুঁ—নিরঞ্জন হিসেব করে বলতে পারে—আর সেই দেহ সে এ যাবৎ দেখতে পায়নি। অনু বিয়ের কনে বদলের কারচুপির মত বিয়ের পর থেকে আরেকটা দেহ তাকে দিয়েছে বা দিয়ে আসছে। এখানেই নিরঞ্জনের আসল যন্ত্রণা। অতৃপ্তির গভীরতম কারণ যেন এইটেই। আঃ, সেই দুপুরটা ছিল জীবনের চরম পাওনা মেটবার শুভ সময়। তারপর থেকে সবই ফাঁকির কারবার। নিরঞ্জন চাইলেই অনু অবশ্য একটা একটা করে পাপড়ি খুলে ফুল-দলটিকে মুক্ত করে দেবার মতো, ব্লাউস ব্রেসিয়ার সাড়ি এবং সায়া নিপুণ শান্ত হাতে খুলে দিতে পারে—কিন্তু নিরঞ্জনের বারবার সন্দেহ হয়, সে ঠকছেনা তো?

···বিয়ের আগের রাতে অনু পালিয়ে এল। কলকাতা গিয়ে রেজেষ্ট্রি করে বিয়ে হল দুজনের। নিরঞ্জন হঠকারীতার বশে এটা করে বসল। পরে দেখল, কর্তব্যপরায়ণ পুত্র একটা প্রকাণ্ড ফাঁকি দিয়ে ফেলেছে পরিবারে। সেটা পূরণ করার জন্যে টাকা পয়সা ছাড়া আর কী ছিল? অভাবী সংসারটাকে সে বাজেটের ডবল টাকা দিয়ে সন্তুষ্ট করতে চাইল। তারফলেই পান্নাবোস···

নিরঞ্জনবাবু!

কড়া ধমক এবং বেটনটা টেবিলে অল্প শব্দ করেছে। নিরঞ্জন তাকাল। হ্যাঁ, পান্নাবোসের সাথে পরিচয় না হলে আরও একটা ক্ষতি হত তার। অনুর মামার খুসি হওয়া উচিত ছিল এবিয়েতে। খুসি হয়নি। আসলে সবই সেন্টিমেন্টের ব্যাপার। সেই মুহুরী-বাবুটিও নাকি দারুণ দুষ্ট প্রকৃতির লোক। তার রাগ পড়ছিল না। অনুর মামা নাকি ওর কাছে অপমানিত হচ্ছিল। এমন কি শেষ অব্দি নিরঞ্জনকেও শাসিয়ে গিয়েছিল একদল ছেলে—মুহুরীবাবুর পক্ষ থেকে। তবে রে ব্যাটা বিয়েপাগলা বুড়ো! চুঁচড়োয় পান্না-বোসের একটা ছোটোখাটো গ্যাং রয়েছে। তারাই ব্যাপারটা নিষ্পত্তি করে দিল। মুহুরীবাবু প্রাণের ভয়ে গাঙ পেরিয়ে নৈহাটি পালাল। ফলে অনুর মামা আরও চটল। আজকাল একটুতেই তো হুজুতহ্যাঙ্গামা বেধেই রয়েছে। কী থেকে কী রূপ নেয়—সামান্য ব্রণ থেকে আস্ত ফোঁড়া·· শালা যুগটাই এরকম!

নিরঞ্জন বলল, জল খাব।

জল এল। ঢকঢক করে খেল সে। প্রশ্ন এল ফের—কই, বলুন নামটা?

নিরঞ্জন নিষ্পলক তাকিয়ে বলল, কার নাম?

যে ছেলেটি উণ্ডেড্ হয়ে আপনার কোয়াটারে ছিল!

চিনি না। সমীর না কী বলছিল যেন।

কে রেখে গিয়েছিল তাকে?

চিনি না। অন্ধকারে একজন এসে পিস্তল দেখিয়ে বলে গেল, এ থাকবে। বাইরে জানাজানি হলে তোমাকে খুন করব। আমি কী করতে পারি বলুন? সর্বক্ষণ তো আপনারা আমার বডিগার্ড দিচ্ছেন না—সেটা সম্ভবও নয়।···নিরঞ্জন বেশ বুদ্ধি বিবেচনা সহকারে এই কথাগুলো বলল।

বেশ বলতে পারছেন, দেখছি! হ্যাঃ হ্যাঃ হ্যাঃ।

সত্যি কথা বলব না কেন? আমার মাথা তো কেটে নিচ্ছেন

না।···বলে হঠাৎ মাথায় হাত দিল নিরঞ্জন। অবাক হয়ে গেল।··· আমার মাথায় ব্যাণ্ডেজ কেন?

মনে পড়ছে না বুঝি? এ্যারেষ্ট করবার সময় যা দৌড় দিয়েছিলেন! বেটন ছুঁড়ে আপনাকে কাত করা হল। পড়লেন লাইনের ওপর দাঁত ছরকুটে! আবার হাসছেন? লজ্জা করে না হাসতে?

নিরঞ্জন হাসি বন্ধ করল। মুখ নামাল। হঠাৎ রেগে গেল কেন লোকটা?

লোকটার নাম কী?

বিশ্বাস করুন, চিনি না।

অন্য একটি অমায়িক কণ্ঠ প্রশ্ন করল, বেশ, বেশ। বলুন তো স্যার, কথা ইংরিজি না হিন্দি না বাংলায় বলেছিল সে?

বা-বাংলায়।

ইংরিজিতে নয়?

না।

বেশ। হিকি জেমস নামটা চেনা লাগছে?

হ্যাঁ—না।

হ্যাঁ, না—না?

শুনেছি-শুনেছি মনে হচ্ছে।

শুক্কুরবার বিকেলে একজন সাহেব বা এ্যাংলো নেমেছিল ষ্টেশনে? আপনি গেটে টিকিট নিচ্ছিলেন কিন্তু।

হ্যাঁ, নেমেছিল। এমন তো অনেক আসে—গীর্জে দেখতে আসে ফরেন ট্যুরিষ্টরা।

সে ফিরে গেল কোন ট্রেনে?

ফিরতে তো দেখিনি।

কড়া ধমক এল ফের।···নিরঞ্জনবাবু, আপনার স্ত্রীকেও আমরা এবার এ্যারেষ্ট করব। ভেবে দেখুন, আপনি কনফেস না করলে আপনার স্ত্রীকে আমরা যেভাবে হোক কনফেস করাবই।

নিরঞ্জন কাঁদোকাঁদো মুখে বলল, আপন গড—সে কিচ্ছু জানে না।

তাহলে আপনি জানেন। বলুন।

নিরঞ্জন চুপ। নখ খুঁটতে থাকল।

বললেন না! চাকলাদার! তেওয়ারী, চাকলাদারকে ডাকো!··· এই যে, চাকলাদার! এক্ষুণি মৌরীগ্রাম ষ্টেশন কোয়াটারে যাও। নিরঞ্জনবাবুর স্ত্রীকে নিয়ে এসো। রকসো চাপিয়ে নিয়ে আসবে। সাবধানে, সে-মাগীই এর রিংলীডার—ব্লাউসের ভেতরে পিস্তলটিস্তল থাকতে পারে।

নিরঞ্জন হাঁউমাউ করে চেঁচিয়ে উঠল—মিথ্যে, মিথ্যে! অনু তা নয়—অনু ভারি ভালো—সচ্চরিত্রা মেয়ে। অনু আমায় নিষেধ করেছে বরাবর—আমি শুনিনি! বিশ্বাস করুন আপনারা। অনুকে—দোহাই আপনাদের—অনুকে অপমান করলে আমি ম-মরে যাব।···দুহাতে ব্যাণ্ডেজশুদ্ধ চুল টানতে থাকল নিরঞ্জন।

টেবিলের ধারে মুখগুলো চুপিচুপি হাসল। চোখাচোখি করল। তেওয়ারী নিরঞ্জনকে ধরেছে ততক্ষণে। ব্যাণ্ডেজ উপচে রক্তের ছোপ দেখা দিয়েছে।

নিরঞ্জন হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, ওরে বাবা! পান্না বোস আমায় মেরে ফেলবে। ছেলেবেলা থেকে ওকে চিনি। ও সব পারে। আমি কিছুতেই তার নাম বলব না। না—না—না!

প্রতি বিকেলে ফুলবাগিচায় কিছুক্ষণ কাজ করা দেবীবাবুর অভ্যাস। মালী একজন আছে। সে ততক্ষণ ঘাসে পাছা রেখে পা দুটো ছড়িয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। এবং মাঝে মাঝে ফোঁস করে একটা সরেস দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে।

দেবীবাবু বললেন, মুকুন্দ, এ হে হে! করেছিস কী রে হতভাগা! ছ্যা ছ্যা ছ্যা!

মুকুন্দ আকাশ থেকে নিজেকে নামিয়ে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বলল, আজ্ঞে?

কিন্তু আর কথা নেই কর্তার মুখে। ওটাই অভ্যাস। কর্তা পপিচারার ঝাঁকে ঝুঁকে একটা কাঠি দিয়ে কী সব খোঁচাচ্ছেন। মুকুন্দ আশ্বস্ত হয়ে ফের আকাশে উঠে গেল।

সুশি সামান্য সাজগোজ করে বেরিয়ে এল এতক্ষণে। ষ্টেশনে পরপর দুরাত্তির হাঙ্গামার পর তার সম্পর্কে সতর্ক হয়েছেন বাবা। যেখানে-সেখানে যখন-তখন বেড়াতে যাওয়া মানা। সকালে যাবার কথা ছিল পায়রাডাঙা নাজমাদের বাড়ি। গাড়ি পাওয়া যায়নি—সেটা কথা নয়। বাবা বারণ করছিলেন। সামান্য কথাকাটাকাটি করে সুশি গুম হয়ে গিয়েছিল। দেবীবাবু ভেবেছিলেন, রেগেছে—রাগুক। একটা কিছু ঘটে গেলে তখন তো কোন সান্ত্বনাই পাওয়া যাবে না। সুশির মা ছিঁড়ে খেয়ে ফেলবে একেবারে। তা সুশি রাগ করে ব্যাগ খুলেছিল। চে গুয়েভারার ডায়রী আছে তার ব্যাগে। পড়ছিল বইটা। তার মনে হচ্ছিল, এ জায়গাটাও বেশ চুটিয়ে লড়াই করার মতো। ওই জঙ্গলটা—মাঠ, নদী, খালবিল, বাঁশবন—দারুণ ফিট করে যায় গেরিলাকৌশলের পটভূমি হিসেবে। তার গা শিরশির করছিল। হঠাৎ একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছে গিয়েছিল সে।

তাহলে কি সমু···

সমুর পায়ে চোট লেগেছে এবং রক্ত এবং তাকে নিয়েই নাকি সেদিন সন্ধ্যায় অত সব খুনোখুনি!

তাহলে কি সত্যিসত্যি এখানে···

পুরো বাক্যটা ভাবতে তার অস্বস্তি হচ্ছিল। আধখানা ভেবেই তার সক্রিয় মন চুপ করে যেতে চাচ্ছিল। মন ঘুরে যাচ্ছিল অদূরের বাঁশবনে ডেকেওঠা পাপিয়া কোকিল ইত্যাদি সত্যিকার পাখিদের

আওয়াজের দিকে। মন ঘুরে যাচ্ছিল বলেই সে দেখতে পাচ্ছিল, দূরের শিমূলে ফুল ফুটেছে লাল, এবং তাদের খামারের বেড়ার ধারে ওইসব মন্দার। ধেৎ, এ সময় এই সব জায়গায় রাগ করে তাকে শুয়ে থাকতে হচ্ছে!

কিন্তু বিশ্বাস হয় না সমু বিপ্লবা। নাজমার সঙ্গে এ নিয়ে তার আলোচনা হয়েছে। নাজমা বলেছে, হতেও পারে। কিচ্ছু অসম্ভব নয়। এখানে ওঁরা হয়তো একটা 'মুক্তাঞ্চল' গড়তে চান। তবে পারবেন না। এখানে অনেক বড় বড় জোতদার আছে। তাদের হাতে সব খুনে গুণ্ডা প্রকৃতির প্রচুর লোক রয়েছে। ওই যে ফারুদার সঙ্গে দেখা হল—সে কিন্তু সহজ ছেলে নয়। বাবা ওকে···রহস্যপূর্ণ হেসে চুপ করে গিয়েছিল নাজমা।

সুশি বলেছিল, যাই বলো—সমুদার তেমন পড়াশুনাই যে নেই। সে হুজুগে পড়ে পলিটিকাল সংঘর্ষে ছুটোছুটি করত মাত্র। আমি চিনিনে ওকে? রাজনীতি সম্পর্কে সামান্য কনসেপসন যার নেই, সে—ফুঃ!

নাজমা একটু হেসে বলেছিল, তাহলে ওকে নিয়ে মাথাব্যথা কেন?

মাথাব্যথা মানে?···চটতে গিয়ে সুশিও হেসে ফেলেছিল।··· আরে না, না। মানে—পাড়ার ছেলে—ছেলেবেলা থেকে চেনা-শোনা। বিদেশে গিয়ে নাকি দেশের নেড়ি কুকুরটার সাথে দেখা হয়ে গেলে ঠাকুর মনে হয়—বাবার কথা এটা।···সুশি ভীষণ হাসছিল।

ওকে নেড়িকুকুর বলে দিলে!···নাজমা ফুট কাটল।

দিলুম। আমার ইচ্ছে।···সুশি খুব জোরে জোরে হাঁটছিল এবার।

প্রসঙ্গটা ওখানে শেষ। নদীর ব্রীজে এসে রেখার কথা ওঠে। ওরা দুজনেই একমত হয়েছিল এ ব্যাপারে। রেখার বয়স যাই হোক, ভীষণ পাকা। ডেঁপোর চূড়ান্ত। কী ফাজিল আর নির্লজ্জ!···

সুশির চে গুয়েভারা পড়া আর হয়নি। সে কেবল সমুর কথা ভাবছিল। সমু—আচ্ছা, সমু তো কোনদিন তাকে কোন আজেবাজে কথা বলে ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করেনি। কেন করেনি? সুশিকে তার ভালো লাগে না বুঝি?···সুশির মনটা হঠাৎ ভারি হয়ে কোথাও ডুবতে চাচ্ছিল। কোথাও একটা ভুল হচ্ছে। পাড়ায় যাকে মনে হত মস্তান—মৌরীগ্রামে এসে তাকে মনে হচ্ছে বেশ ইমপরট্যান্ট পারসন। আর ওর পায়ে রক্ত—যন্ত্রণা—মূর্ছা যাওয়া।

অসহ্য লাগছিল সুশির। সমুটা অসহ্য হয়ে উঠছিল তার কাছে। একটা হঠকারী দায়িত্বের মতো। আকস্মিক এবং খুবই অকারণ একটা দুঃখবোধ। হয়তো সহানুভূতিও। কিন্তু কেন?

এবং যদি সত্যিসত্যি সমু একজন আণ্ডারগ্রাউণ্ড বিপ্লবী হয়।···

সুশির মনটা নেচে উঠেছিল ফের। মুহূর্তে হালকা হয়ে উঠেছিল সে। আজ এ বেলাটা শুধু সে ভাববে। ভাববে বিপ্লব, মুক্তাঞ্চল, সমু আর তার নিজের কোন আসন্ন ভূমিকার কথা।

যা নিতান্ত দিবাস্বপ্ন হোক, অন্তত এখানে বেড়াতে আসার কিছুক্ষণটা কোন মূল্যবোধে ভরিয়ে দেবে। হয়তো বা এ বয়সে ওইটেই প্রাণের নিয়ম—চারপাশ থেকে খুঁটিয়ে কুড়ানো এবং তাই নিয়ে একটা গভীর তাৎপর্য আবিষ্কার করা।···

এতক্ষণে বিকেল। এবং সুশি বেরিয়ে এসেছে। হালকা মন। ফের সেই ছুটির নেশাটা লেগেছে—সোজা বলে দিল গিয়ে—বাবা, বেরোচ্ছি।

দেবীবাবু পপির ঝাঁক থেকে মুখ তুলে বললেন, মুকুন্দ—এবার নে বাবা।

মুকুন্দ যথারীতি আকাশ থেকে নেমে দাঁড়াল। অকারণ হাসল।

দেবীবাবু বললেন, আকাশে কী দেখিস রে মুকুন্দ? দিন দুপুরে তারা গুণিস নাকি? হ্যাঃ হ্যাঃ হ্যাঃ! তখন থেকে দেখছি হাঁ করে···সুশি, বেরোচ্ছিস? তা—হুম···

দেবীবাবু মেয়ের স্বভাব জানেন। বেড়াতেই তো এসেছে। প্রকৃতির মধ্যে কী আছে না আছে, ওর জানা দরকার। প্রকৃতি থেকে দূরে সরে গিয়েই তো মানুষের এত লাঞ্ছনা। দেবীবাবু প্রকৃতির কাছে এসেই কিনা পুরো মানুষটি হতে পেরেছেন। বললেন, তা—ইয়ে, জিপটা এসে গেছে। নিয়ে বেরো। ভুজঙ্গকে বলে দিচ্ছি গঙ্গার ধার অব্দি ঘুরিয়ে আনবে। শিগগির ফিরবি কিন্তু।

সুশি মাথা দোলাল।

নাকি চৌধুরীর ওখানে যাবি ?

সুশি ফের মাথা দোলাল।

তাই যা বরং। ওখান থেকে নাজমাকে নিয়ে সোজা গঙ্গার ধারে চলে যাস। ভুজঙ্গ, অ ভুজঙ্গ !

ভুজঙ্গ বেরিয়ে বলল, স্যার !

ডাইরেকশানটা শোন। পায়রাডাঙা থেকে বেরিয়ে একটা তেমাথা পাবে। সোজা কুসুমপুরের দিকে এগোবে। কুসুমপুর পেরিয়ে বাঁহাতি গেলে মধুপুর, ডাইনে গেলে উদ্ধারণপুরের শ্মশান। তুমি বাঁয়ে যাবে কিন্তু। মধুপুরের দিকটায় ঝাউবন-টন আছে, বেশ নিরিবিলি, ইয়ে—পাখিটাখি ডাকে। ওখানটায় দহ নেই—পুরোটা চরপড়া—আজকাল তো গাড়ি পার হওয়া সোজা। সুশি, বালির চড়ায় ছুটোছুটি করে দেখবি, সে ভারি মজা। একরকম লেজনাচানো পাখি আছে। বেশ তুড়ুক তুড়ুক করে নাচে।

দেবীবাবু হাসতে লাগলেন। কারণ নাচের কথায় নিজের অসচেতন বিহ্বলতায় পাছাটা দুবার দুলিয়ে দিয়েছেন।

সুশির মন ভরে গেল। আঃ, পৃথিবী এত ভালো। জীবনে এত সুখ। এখনও কোথাও পাখিরা ডাকে এবং নাচে—পড়ে আছে অবাধ নির্জন ছোটাছুটির নরম বালুচর—মর্মরিত ঝাউবন—কালো জল এবং বাবার নাচটুকু সেইদিকে উৎসর্গীত হল।

কিছুক্ষণের জন্যে সে ভুলে গেল সমু এবং বিপ্লব। মুক্তাঞ্চল এবং চে গুয়েভারা।

মঘার ডাকে চোখ খুলল সমু।

মঘা ক্রাচদুটো রেখে ওর পায়ের কাছে বসল।...আজ দু'পহর রেতে তোমার বড়দা আসবে। টিশিনে গিয়েছিলুম। ফারুক বলে পাঠালে।

সমু কথা বলল না। লাল চোখে তাকিয়ে থাকল ঝুলেপড়া খড়ের কালো চালটার দিকে।

জ্বর বেড়েছে নাকি? দেখি।

মঘা ঝুঁকে আসতেই সমু খাপ্পা হয়ে বলল, ছুঁতে হবে না। থাক্।

লে বাব্বা! আমি পর হয়ে গেলুম!...খিকখিক করে হাসতে লাগল মঘা।...নাকি হেঁদু বামুনের ছেলে—গায়ে হাত দিলে জাত লষ্ট হবে। এ্যাঁ? না—কথাটা তা লয় অবশ্যি। জাত তুমি মানো না। ডাকাতের আবার জাত? তা—হ্যাঁ গা, ডাক্তোরের ব্যবস্থা করেছেল, না করেনি?

সমু জবাব দিল না।

অসুবিধে আছে! সে তো বুঝি রে বাবা। কেউ আসতে চাইবে না। আর, বাঞ্চোত এই পায়রাডাঙা আবার একটা জায়গা? আমাদের ছোটবেলায় দেখেছি, একজন ডাক্তোরবাবু ছেল গাঁয়ে—তিনি হল গে দেবীবাবুর বাবা। কী নাম ছেল যেন—হুঁ, উদ্রু বাবু—না, না—রুদ্রুপেসাদ বাবু। বিরাট বড়লোক। মস্তো ঘোড়া। বিস্তর জমিজমাও করেছেল তিনি। এ হারামী গেরাম তাঁকে সইবে কেন? মন্দ লোকেরা হিংসেয় পড়ে জমির ফুলন্ত ধান মাঠকে মাঠ ডগা ছেঁটে দিত। খড়ে আগুন ধরিয়ে দিত।

দলাদলির অত্যাচারে তিনি পালালেন গাঁ ছেড়ে কলকাতা। তেনার ছেলে পরে লায়েক হয়ে মৌরীগাঁয়ের মাঠে বসলেন 'ফেরাম' খুলে। যদি বলো, দলাদলিটা ছেল কার সাথে? এই হাতেম চৌধুরার বাবার সাথে গো! হাতেম হলেন দেবীবাবুর দোস্ত। বাপে বাপে বিবাদ, ছেলেয় ছেলেয় বন্দু। তারি মজার ব্যাপার! হিঃ হিঃ হিঃ! ...তখন বলছিলে না ছোটবাবু? শালা মানুষ যেন কী। ঘেন্না হয়। থুথু দিতে ইচ্ছে করে। তা সত্যি। কেননা বাপে বাপে শত্তুর, ছেলেয় ছেলেয় দোস্ত! লে মজা!...তা হাতেম সাহেবই ওনাকে গাঁয়ে ফিরিয়ে আনলেন। গাঁয়ে—মানে ওই মাঠের মধ্যিতে। তা হোক, জন্মোস্থান তো বটে। এখেনেই লিখেস লিয়েছেন, এই মাটিতেই খেলাধূলো! মোন কি কলকাতার ইটপাথরে ভরে ছোটবাবু? ভরে না। সোতরাং...

সমু মুখ খুলল।...তুমি বেশ গল্প বলতে পারো তো?

পারি। আজকাল ওই তো হয়েছে গো।...মঘা খুসি হয়ে বলল।...আগে মুখের দরকার হত না। মানে কি না—ডাকাতগুণ্ডা মানুষের মুখ খোলা বারণ। এখন আমি জাতছাড়া। কাজেই মুখ চালাতে ভয়টা কিসের?

এবার একটু থামবে? কান ভোঁ ভোঁ করছে।...সমু বিরক্ত হয়ে বলল।

অ। তুমি রাগ করে বলছ।...মঘা পাছা ঘেঁষড়ে বেরল। ছোট্ট বারান্দায় তার উনুন। রান্না চাপাতে হবে। বাইরে থেকে সে আপন মনে বলল, এ আরেক ঝামেলা। শালা জানটা এত শক্ত, আজরাইলের বাপের সাধ্যি নেই যে টেনে বের করে। কবে হারামী প্যাটটাকে কুপিয়ে ফালা ফালা করে ফেলব। মঘা কবে মরে গেছে, মঘার প্যাটটা দিব্যি বেঁচে আছে—এ কী সমিস্তে রে বাবা!

সমু সারাদুপুর সব আশ্চর্য স্বপ্ন দেখেছে। খেলার মাঠ, সুন্দর সুন্দর ছেলে-মেয়েদের ছুটোছুটি, উড়ন্ত ফুটবল, ব্যাগপাইপের বাজনা,

তারপর রেলগাড়ি আর রেলগাড়ি।···মায়ের সঙ্গে কোথায় যাবে বলে অপেক্ষা করছে, সেই ট্রেনটা আর আসে না। কিন্তু হঠাৎ সে ডাঃ বিধান রায়কে স্বপ্নে দেখল কেন? কালো শার্ট, কালো প্যান্ট, চোখে চশমা—ডাঃ বিধান রায় তাকে কিছু বললেন যেন।···ফের এল সব অদ্ভুত ছোটছোট ঘোড়া, পিঠে সৈনিকরা, ঘোড়াগুলোর বড়বড় কাজলটানা চোখ, গায়ের রঙ ঘন নীল। কে বলল, ওরা যুদ্ধ করতে এসেছে—ওরা বিদেশি। যুদ্ধ। সমুর হাতে বোমা। সমুর হাতে পাইপগান। পান্নাদা অমানুষিক আওয়াজ দিচ্ছে সা—বা—ড়। কাকে মারতে হবে? ওই ঠাং কাটা কানা শয়তানটা ক্রমাগত তার দিকে একচোখে তাকিয়ে আসছে আর আসছে। তাকে মারা যাচ্ছে না।···

স্বপ্নগুলো স্মরণ করতে থাকল সে। সেই সময় বাইরে কোথাও কোকিল ডাকল এবং আমমুকুলের গন্ধ এল। মনে পড়ল, লাল ফুল দেখেছিল। সুশিদের খামারের নিচে ছোট্ট নদীর কালো জল দেখেছিল। বিদ্যাসাগর বর্ণবোধে লিখেছিলেন—লাল ফুল, কালো জল। এতদিনে দেখেছিল। ছেলেবেলায় তার আবছা মনে হত, সেও বিদ্যাসগরের মতো কোন গাঁ থেকে শহরে এসেছে এবং পুরো পথটা পায়ে হেঁটে।···

হঠাৎ মনে পড়ল, নাজমার কথা। নাজমা তো আর এল না। না আসুক। ও আসা মানেই একটা নিষ্ঠুরতম প্রশ্ন সামনে এসে দাঁড়ানো। ও একটা নির্বোধ বিশ্বাস—নির্বোধ বিশ্বাসের সম্ভাষণ একটা মুখোসপরা জঘন্য মিথ্যার প্রতি: বিপ্লবী, তুমি কেমন আছো এখন? বিপ্লবী, তুমি সেরে ওঠ। দেশের গরীব মানুষেরা তোমায় চায়।

রাগে দুঃখে চোখে জল এসে গেল সমুর। এমনি করে বিনা চিকিৎসায় কি সত্যি সত্যি তাকে মরে যেতে হবে? মিথ্যা পরিচয়ের মুখোসটা মৃত্যুর কতক্ষণ পরেও তার লাসের ওপর পড়ে থাকবে। তারপর হয়তো মঘাই সেটা টেনে ছুঁড়ে ফেলে দেবে। ওই একচোখো কানা শয়তানটা হো হো করে হাসবে!

বাইরে হয়তো চমৎকার একটা বিকেল নেমেছে। এইসব পাড়াগাঁয়ে এইসব নির্জনতা আর স্তব্ধতার মধ্যে জীবনের কিছু ভূমিকা ছিল—যা জানা গেল না। দেখা হল না। সে যদি হাঁটতে পারত, ফের তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখত বসন্তের কোন কোন দীর্ঘ গাছের শীর্ষে লাল লাল সব ফুল। সেদিনের মতই অবাক হত। বর্ণবোধের কথা তার মনে পড়ে যেত। সে ভাবত সেই আরম্ভের দিনগুলো।

…সমুদা!

…সমু তাকাল।

…এই দেখুন, কে এসেছে!

সুশি এগিয়ে এসে ঘরে ঢুকল। বলল, বাপস। কী অন্ধকার আর দুর্গন্ধ! এরি মধ্যে দিব্যি পড়ে আছো দেখছি। ধেৎ! পাশে বসল সে।

নাজমা চাপা গলায় বলল, এই, বেশিক্ষণ থাকা চলবে না কিন্তু। দুপুরে বাবার কাছে পুলিশ এসেছিল। কীসব জিগ্যেস করে গেছে!

সুশি বেপরোয়া হয়ে বলল, আসুক না। সমুদা একাই একশো। সমুদা, দেখি, দেখি…ইস্! কী জ্বর! ওষুধ খাচ্ছ না?

নাজমা বলল, সমুদা, ফারু এই ট্যাবলেটগুলো পাঠিয়েছে। তিনঘণ্টা অন্তর খাবেন। একসঙ্গে দুটো কিন্তু—একটা বড়, একটা ছোট।

নাজমা পুরিয়াটা বালিশের পাশে রাখল। সমু হাসবার চেষ্টা করছিল। বলল, সুশি, তোমার হাতটা তো বেশ ঠাণ্ডা।

সুশি হাত তুলল না। নাজমার দিকে ঘুরে বলল, তোমাদের থার্মোমিটার নেই? নিয়ে এসে না?

নাজমা বলল, আনছি। তারপর বেরিয়ে গেল।

মঘা বাইরে উনুন জ্বেলেছে। সুশি দরজার দিকে একবার তাকিয়ে একটু ঝুঁকল সমুর দিকে। চাপা গলায় বলল, খুব কষ্ট

হচ্ছে—না? কী করব বলো? এমন অজ পাড়াগাঁ—কোনো ডাক্তার ফাক্তার নেই। তাছাড়া—সেও বড্ড রিস্কি ব্যাপার। সমুদা, তোমাদের পার্টি থেকে ডাক্তার পাঠাচ্ছে না কেন?

সুশির শ্বাসপ্রশ্বাস ঝাপটা মারছিল সমুর মুখে। যে ফুলের নাম সে জানে না, যে ফুল জীবনে ছাখেনি, যা সত্যিসত্যি আছে কিনা তাও জানা নেই—সেই আশ্চর্য এবং অলীক ফুলের গন্ধ ওই শ্বাসপ্রশ্বাসে। এবং সে আচমকা দুহাত দিয়ে সুশির মাথাটা ধরে নামিয়ে আনল এবং চুমু খেল।

সুশি নার্ভাস হয়ে ছাড়িয়ে নিল তক্ষুনি। কিন্তু কিছু বলল না। কেবল সেই আবছা অন্ধকারে আদিম ঘরটার ভিতর তার বিব্রত হাসিটুকু ভেসে উঠল।

সমু আস্তে আস্তে বলল, রাগ করোনা সুশি।

সুশি নখ খুঁটতে খুঁটতে ছোট্ট করে বলল, না। কেন?...

ছয়

আজ রাতে চাদ্দিকে আলো আছে। জায়গায় জায়গায় বন্দুক নিয়ে সেপাইদের পাহারা আছে। গেরোচনা গাছটার নিচে থানার একটা কালো ট্রাকও রয়েছে।

কিন্তু সন্ধে থেকে আগের মত হইচই চলাফেরা নেই। অল্পস্বল্প কিছু রেলযাত্রী কিছু ভিড় ওদিকটায়। কোয়াটারের পথটা নিরিবিলি হয়ে গেছে। শক্তিব্রত বলছিলেন, দুএকটা দিন যেতে দাও। ফের সব ঠিক হয়ে যাবে। মানুষ কীই বা মনে রাখে? আর মনে রাখলে তো এ্যাদ্দিন পৃথিবীটা শ্মশান হয়ে যেত।

আজকাল খবর তক্ষুনি তক্ষুনি ছড়িয়ে পড়ে। ছড়িয়ে পড়েছে। তাই ভিড় কম। মন খুলে কেউ চেঁচামেচি করতে পারছে না। অন্য স্টেশন থেকে এ স্টেশনে আসাটা গেছে কমে। এ স্টেশন থেকে অন্য স্টেশনে যাওয়ার ট্রেন ধরতে যারা আসত, তারা ভাবছে—দুএকটা দিন যাক্। মজার দৃশ্য চোখে পড়েছে অনুর। ট্রেন থামতে না থামতে ছাড়বার হুইসিল বাজাবার তালে আছে। লাইনক্লিয়ার না থাকলে ঘনঘন বাজে সেটা। অনু আজ সারাদিন দেখছে, যে ট্রেনই আসুক—তার অনেকগুলো জানালা দরজা বন্ধ। কদচিৎ কোন কোন যাত্রী দুঃসাহসে উঁকি দিচ্ছে। তাদের চোখগুলোর ভয়ঙ্কর কিছু দেখবার ব্যাকুলতাটুকু এতদূর থেকেও টের পাচ্ছিল সে। কিন্তু কড়া পাহারা তো সবখানেই। সান্টিং ইয়ার্ড ঘিরে ঘোরাঘুরি করছে রেল-পুলিশ। প্লাটফরমে রীতিমত ক্যাম্প পড়ে গেছে ওদের। যারা ভয়ঙ্কর কিছু ঘটাতে পেরেছিল—তাদের কাজ তো শেষ। এখন এই ব্যস্ততার কোন মানে হয়? রেখার মতো মেয়েও বলছিল, চোর পালালে মানুষের বুদ্ধি বাড়ে। এখন আর এসবে কী হবে শুনি? বুড়ো মানুষটাকে যখন মিছেমিছি সবাই···

রেখাকে বাকরুদ্ধ হয়ে কাঁদতে দেখে অনু অবাক হয়েছিল। পরে অবাক হয়েছিল নিজের এই অবাক হওয়াটা লক্ষ্য করে। বা রে! রেখা কি কাঁদবেনা, না কাঁদতে জানে না? কী ভেবেছিল সে রেখাকে?

এখন রাত গভীর হয়েছে। রেখাকে শুতে ডেকেছিল অনু। রেখা এসে শুয়ে আছে। কিন্তু ঘুমোয়নি। সেই সাংঘাতিক ঘটনাটা, আশ্চর্য, যেন কোন দাগই কাটেনি রেখার মনে। সে লোকের ভয় পাওয়া নিয়ে কৌতুক করছে।...জানো বউদি, সেই বুড়োটা—বুড়োটা আজ বিকেলে ওভারব্রীজে ওঠেনি। আসেই নি এদিকে। আর, সুবর্ণর মাকেও তো দেখলুম না প্লাটফরমে! হরুবাবুদের চাকরটা কুকুরকে পায়খানা করাতে এনেছিল—সেপাইগুলো তেড়ে ধমক লাগাল। দে ছুট্ একেবারে। কুকুরটা কিন্তু বাঘের মতো দেখতে। ছেড়ে দিলে ছিঁড়ে খেত। খেত না বউদি?

অনু বলল, তোমার ঘুম পাচ্ছে না রেখা?

উঁহু। আপনার?

না।

ঘুম আসা কি চাট্টিখানি কথা? দাদার এতক্ষণ কী যে হচ্ছে!

কী হবে?

প্রশ্নটার জবাব দিতে পারল না রেখা। একটু হাসল বিব্রতভাবে। তারপর বলল, ওঁর মাসতুতো ভাই বদমাস। বেড়াতে এসে কী সব করে বসল—তার জন্যে দাদাকে হয়রানির কোন মানে হয় না! বউদি, দাদা কখন আসবেন?

অনু একটু চুপ করে থেকে বলল, যখন ছাড়বে।

কিছুক্ষণ দুজনেই চুপ। তারপর রেখা বলল, বউদি দাদাকে ওরা যদি না ছাড়ে! বাবা বলছিল,...থেমে গেল রেখা।

অনু একটু শিউরে উঠল হঠাৎ।...কী বলছিলেন তোমার বাবা?

রেখা ঢোক গিলে বলল, বাবা বলছিলেন—খুব সাংঘাতিক কেস। ওর আবার জেলুফেল না হয়ে যায়।..কিছুক্ষণ আবছা দেয়ালের

দিকে তাকিয়ে থেকে ফের সে বলল, বাবা বলছিলেন জেল হলে চাকরিও থাকবে না।

অনু দারুণ চমক খেল। সত্যি তো—এই সহজ সম্ভাবনার কথাটা কিছুতেই তার মাথায় আসেনি। এ তো তার অনেক আগেই ভাবা উচিত ছিল। বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠল তার। তালু আর জিভ শুকনো লাগল। কাঠ হয়ে পড়ে রইল সে।

রেখা ডাকল, বউদি, ঘুমোলে ?

উঁ ?

ঘুমোও।

রেখা !

সেইসময় প্রচণ্ড গর্জন করে একটা ট্রেন চলে গেল। জানালার ফাটল দিয়ে তার আলোর হালকা কিছু রেখা সামনের দেয়ালে কেঁপে কেঁপে অদৃশ্য হল। অনু বলল, রেখা, কাল সকালে একবার আমার সঙ্গে যেতে পারবে ?

কোথায় ?

যেখানেই হোক। খুব জরুরী কাজ আছে। তুমি যাবে আমার সঙ্গে ?

যাব না কেন ? কখন যাবে বলো।

সকালের দিকে হলেই ভালো হয়। একটু সকাল সকাল তুমি রান্নাটা সেরে ফেলবে। কেমন ? বাবাকে কিন্তু খুলে বলবে না কিছু। বলবে যে বউদির সঙ্গে একজায়গায় বেড়াতে যাচ্ছো, শিগগির ফিরবে।

সে আমি দেখব'খন।

আচ্ছা রেখা, স্টেশনের পূর্বদিকটায় একটা রাস্তা আছে—ওখানে রিকশো চলে ?

দেখিনি তো !···না, না। চলে বউদি, চলে।

সেদিন সকালে যে মেয়েদুটো এল, ওরা তো ওদিক থেকেই এসেছিল। তাই না ? কিসে এসেছিল ওরা ? রিকশো করে ?

না। সাইকেলে। ছাখোনি? সাইকেলটা আমাদের জানালার বাইরে ছিল।

দেখিনি।

শাড়িপড়া মেয়েটির কা নাম যেন মনে আছে তোমার?

হ্যাঁ, সু—দাঁড়াও বলছি—সু সু···সুশ্বেতা ব্যানারজি। আর মুসলমান মেয়েটার নাম···পেটে আসছে, মুখে আসছে না। কেমন নামটা যেন···ধুত্তেরি ছাই!

সুশ্বেতার বাবাই তো দেবী ব্যানারজি?

হ্যাঁ। গতবছরের লেখাগুলো এখনও আছে না? দেখবেন, কত জায়গায় আছে। স্টেশনের দেয়ালে তো বড় বড় করে লেখা আছে। ইলেকশনে দাঁড়িয়েছিল, হেরে ভুট হয়ে গেছে। হি হি করে হাসতে লাগল রেখা।

খুব প্রভাবশালী লোক, তাই না?

রেখা কথাটার মানে তলিয়ে না দেখে জবাব দিল, খুব বড়লোক নাকি। বড়লোক ছাড়া ভোটে দাঁড়ায় কেউ?

অনু চুপ করে ভাবতে লাগল।

বেশ গরম পড়েছে কদিন থেকে। একটা টেবিলপাখা কেনার ইচ্ছে ছিল নিরঞ্জনের। বলছিল, শিগগির কিনতে হবে।···আর কি কেনা হবে কোনদিনও? বাইরে বেশ হাওয়া দিচ্ছে। হাতপাখাও নেই ঘরে। কিছুক্ষণ উসখুস করে রেখা ফ্রকটা খুলে ফেলল। বালিশের নিচে গুঁজে রাখল। টেপফ্রকপরা ধবধবে বুকের কিছু অংশ আবছা আলোয় দেখা যেতে থাকল। অনুও তার দেখাদেখি ব্রেসিয়ারশুদ্ধ খুলে ফেলল। অস্ফুট বলল, কী গরম!

রেখা চুপিচুপি হাসল। তারপর বলল, তোমাদের আবার দক্ষিণটা বন্ধ। আমাদের খোলা।

অনু বলল, বরং মাথারটা খুলে দাও না। কিসের ভয়? চাদ্দিকে পুলিশ। খুলে দাও রেখা।

রেখা উঠে পূবের জানালাটা খুলে দিল। শান্ত অনুজ্জ্বল অনেক-

খানি আলো দূর থেকে এসে ঘরের ভিতরটা স্পষ্ট করে ফেলল তখুনি। আলোটা আসছে উঁচু প্লাটফরম থেকে। হঠাৎ রেখা বলল, বউদি, বউদি! মজা দেখে যাও!

অনু লাফিয়ে উঠল।···কী, কী?

বাবা। বাবার কাণ্ড ছাখো। এত রাত্রে প্লাটফরমে পায়চারি করছে। কী লোক!

অনু উঁকি মেরে দেখে ফের শুল।···ঘুম আসছে না। যা সব অশান্তি গেল! এস, শুয়ে পড়ো।

রেখা এল। কিন্তু শুল না। খাটে পা ঝুলিয়ে বসল। বলল, বউদি আপনি মনোবাবুকে চেনেন? টিসি?

নাম শুনেছি। কেন?

বাবা বলছিল, মনোই সব বলে দিয়েছে পুলিশকে। দুপুরে আমাদের ওখানে খেতে এসে আপনার দেওরের ব্যাপারটা শুনেছিল।

সত্যি? অনু কৌতুহলী হয়ে মুখ তুলল।

তাছাড়া কারো কাজ নয়—বাবা বলছিল। জানো বউদি, মনোদাটা ভারি বদমাস। যেমন বদমাস, তেমনি অসভ্য। যখন তখন আমার সঙ্গে ফাজলেমি করবে। হাত ধরে টানাটানি করবে···

অনু কথা কেড়ে বলল, বাবাকে বলে দাও না কেন?

বলিনে।···রেখা মুখ নামাল।···বলতে হবে।

তুমি না পারো, আমি বলে দেব।

না, না বউদি! থাক্ গে।

এস, শুয়ে পড়ো।

শুচ্ছি।

কী করো? শুয়ে পড়ো। রাত হয়েছে।

হাত ধরে টানলে রেখা যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও শুল। অনু একটা হাত ওর বুকের ওপর রেখে খুব আস্তে—সোহাগের স্বরে বলল, ঘুমোও।···

একটা মালগাড়ি যেতে থাকল কতক্ষণ পরে। যেন অন্তবিহীন

একটা চলমান ঘটাং ঘট আওয়াজ—কেঁপেওঠা ঘরের ভিতর তার রুদ্ধশ্বাস সাঁৎ সাঁৎ হারিয়ে যাওয়া প্রতিবিম্ব—তার মধ্যে এতক্ষণে ঘুমের আমেজটা এসে যাচ্ছে। তারপর এল স্তব্ধতা। দূরে হাওয়া কাঁপা হুইস্‌লের ধ্বনি। ক্রমঅপসৃয়মান গভীরতর শব্দপুঞ্জ। সেইসময় শক্তিব্রত এসে খোলা জানালায় ওধারে ডেকেছেন, বউমা অ বউমা। শুনছ?

রেখা ঘুমিয়ে পড়েছে। নিঃসাড়। অনু ধুড়মুড় করে উঠল।···কে?

আমি ইয়ে—তা, জানলা খুলেই ঘুমোচ্ছ তোমরা। তাই দেখে চলে এলুম। বন্ধ করে শোও বউমা।

অনু কাঁচুমাচু হেসে—অতিদ্রুত গা ঢেকে ফেলল। তারপর উঠে গেল।···খুব গরম লাগছিল, তাই। বন্ধ করে দিতুম—ঘুম এসে গিয়েছিল।

হ্যাঁ। দিনকাল খারাপ। পাহারা বসালে কী হবে? চাঁদ সদাগরের লোহার পুরীতে ছিদ্র ছিল। হ্যাঃ হ্যাঃ হ্যাঃ। শক্তিব্রত চাপা হাসলেন।

আপনি এখনও ঘুমোন নি? দুর্বল শরীরে ঘুরছেন—অসুখ বাড়তে পারে।

নাঃ। অভ্যাস। সারাজীবন এই তো চলেছে। তোমরা ঘুমোও, চলি।···পা বাড়াতে গিয়ে হঠাৎ ঘুরলেন শক্তিব্রত। কী বলতে মুখ খুললেন। কিন্তু বললেন না। অনুর দিকে তাকালেন।

অনু বলল, কিছু বলবেন?

থাক্। সকালেই বলব। বলছিলুম না, লোহার বাসরে ছিদ্র থাকে। যতঃসব।

অনু টের পেল, আসলে কথাটা বলার জন্যেই ছটফট করছেন বড়বাবু। কিন্তু দ্বিধা হচ্ছে—কারণ হয়তো, এটা অসময়। সে একটু কেসে সহজ ভাবে বলল, এখনও বলতে পারেন। ওর খবর তো?

উঁহু।···শক্তিব্রত ঝুঁকে এলেন জানালায়। চাপা গলায় বললেন,

না বললে ঘুম যেটুকু বা হত, হবেই না। ওই এক বিচ্ছিরি অভ্যাস বউমা! যাক্ গে, শোন—বলাই ভালো। তোমাকে না জানালে স্বস্তি পাব না। ইয়ে—একটু আগে আপের গাড়িতে এক ছোকরা নামল। বুঝলে? প্যাসেঞ্জার ছিল সামান্য কজন। লোকাল ভেণ্ডার আর কে সব যেন। ছোকরাটার হালচাল দেখে আমার সন্দেহ হল। আশ্চর্য, পুলিশটুলিশ রয়েছে এত—কারো কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। ওকে লক্ষ্যও করছেনা কেউ। একেই বলে বজ্র আঁটুনি—ফস্কা গেরো। নিয়মমাফিক ডিউটি সারছে ওরা। এদিকে নাকি শুনছিলুম, সাদা পোষাকে কড়া নজর রাখা হচ্ছে সবখানে। আই বিতে ভরে গেছে মৌরীগ্রাম। ফুঃ, ফুঃ! কিচ্ছু না—কিচ্ছু না। সরকারের অত হুঁশিয়ার লোকজন থাকলে তো দেশটা স্বর্গরাজ্য হয়ে যেত। ফাঁকিবাজদেরই রাজত্ব এখন। এই ছাখো না—ফাঁকি দিতে শিখিনি বলেই এইসব বেয়াড়া স্টেশনে পড়ে আছি।

অনু বলল, সেই লোকটা কী করল?

শক্তিব্রত আরো চাপা গলায় বললেন, হ্যাঁ—ছোকরাটা এদিক ওদিক চাইতে চাইতে স্টেশনের গেট দিয়ে বেরোলো। আমি পিছু নিলুম। দেখি, গোলপার্কের পাশ দিয়ে ব্যাটা শিরিষতলায় এল। তারপর এদিকেই আসতে লাগল। অথচ পঞ্চাশ মিটার দূরে পুলিশ।

অনু রুদ্ধশ্বাসে বলল, তারপর?

তারপর···আমার চোখের ভুল হতেও পারে। তাকে যেন দেখলুম তোমাদের ঘরের এদিকেই এল। আগাছার জঙ্গলটা না থাকলে স্পষ্ট দেখা যেত। যাই হোক, আমি চ্যাচাব কিনা ভাবছি—এমন সময় দেখি, ব্যাটা বেমালুম হাওয়া! দৌড়ে পুলিশগুলোর কাছে গেলুম। বললুম ব্যাপারটা। ওরা সঙ্গে এসে খোঁজাখুজি করল চারপাশটা। কিন্তু তার আর পাত্তা নেই।

অনু শিউরে উঠেছিল। বলল, এই সবে চোখ লেগে এসেছে—এরই মধ্যে এত কাণ্ড। কিচ্ছু টের পাইনি তো।

তার ওপর সর্বনেশে ব্যাপার—তোমাদের জানালাটা দেখছি খোলা। তাই—...

অনু উদ্বিগ্নমুখে বলল, আমার ক্ষতি করে কার কী লাভ হবে? আপনি ভিতরে আসবেন? আসুন না। অমন করে দাঁড়িয়ে কথা বললে কারা কী ভাববে-টাববে।

ভয় নেই। ঘুমোও। আমি যাই। ভেবো না।...শক্তিব্রত হাত তুলে আশ্বস্ত করলেন।...এমনও হতে পারে, কেউ অন্য কারো কোয়ার্টারে গেল—রেলওয়েরই কারো আত্মীয়টাত্মীয় হবে। কলোনী ঢোকার একটা পথও তো এদিক দিয়ে আছে। ঘুমোও। জানালা বন্ধ করে দাও। ভয় পেলে ডেকো। আমি জেগেই আছি। ..শক্তিব্রত চলে গেলেন।

অনু কাঁপুনিলাগা হাতে জানালাটা বন্ধ করে দিল। তারপর রেখাকে জড়িয়ে ধরে গুটিসুটি শুল। চোখে জল এসে গেল স্বভাবত। পৃথিবীটা কেমন—সবে যেন সত্যি করে জানা সুরু হয়েছে এতদিনে। কত দ্রুত চোখের সামনে সবকিছু বদলে গেল!

কিন্তু কে আসতে পারে, কেন আসবে, কী মতলবে—দুশ্চিন্তার চাপে ঘুম এবার চোখ জড়িয়ে দিচ্ছে। অথচ জেগে থাকবার প্রচণ্ড ব্যাকুলতা আছে। ক্রমশ অস্বস্তি হতে থাকল তার।

ফের উঠে সুইচ টিপে দিল সে। আলোয় ঘর ভরে গেল কিছুক্ষণ বসে রইল খাটে পা ঝুলিয়ে। তারপর পা তুলে শুতে এল এবং চমকে উঠল।

রেখার পায়ের কাছে ওই খামটা এল কোত্থেকে? বুকের ভিতর কী একটা তীব্রতা শিসিয়ে উঠল। আচ্ছন্ন চোখে হাত বাড়িয়ে খামটা তুলে নিল। আঠা লাগানো হলদে রঙের খাম। ক্ষিপ্রহাতে ছিঁড়ে ফেলল সে। চোখ জ্বলে উঠল।

একটা চিঠি—ভাঁজ করা। আর এক বাণ্ডিল দশটাকার নোট। চিঠিতে লেখা আছে:

'চুঁচুড়ায় থাকতে একরাত্রে আপনার হাতে খেয়ে এসেছিলুম।

মনে পড়ছে ? গোলমালের দিন সন্ধ্যাবেলায় যখন ছেলেটিকে আনতে গেলুম, চিনতেই পারলেন না আর। না পারা স্বাভাবিক। মাত্র একবারই দেখেছিলেন। নিরু আমার ক্লাসফ্রেণ্ড। বেচারাকে এবারের গোলমালে আমিই জড়িয়ে ফেলেছি। তার সামান্য খেসারৎ পাঠালুম। আড়াইশো আছে। আমার লোকে তদ্বির করছে ওর জন্যে। ইতিমধ্যে আপনারও তো টাকার দরকার। অবশ্য টাকাটা নিরুরই পাওনা। নেহাৎ দয়া করে দিচ্ছি ভাববেন না। পাছে নিতে না চান, তাই এভাবে দেওয়া হল। ভয় করবেন না। আমি এবং আমার লোকেরা আপনার সব রকম ক্ষতির জিম্মাদার। অধিক বাহুল্য। নমস্কার জানবেন।'…

চিঠির তলায় কোন স্বাক্ষর নেই—কোন নাম ঠিকানা নেই।

কতক্ষণ পরে অনুর মনে পড়েছে।

হ্যাঁ, পান্না—পান্না বোস। চুঁচড়োয় সে অনুদের মাথা বাঁচিয়ে ছিল। এক রাত্রে নিরঞ্জনের অনুরোধে খেয়েও গিয়েছিল। ওর সম্পর্কে কত সব আজগুবি ভয়ঙ্কর গল্পই না শোনাত নিরঞ্জন—বলত, পান্না মন্ত্রবলে অদৃশ্য হতে পারে—কোন সাধুর কাছে শিখেছে। পান্নার গায়ে গুলি বেঁধেনো। ভোজালির ধার চটে যায়।

কিন্তু লোকটাকে দেখে একটুও মনে হয়নি তা। হ্যাঁ, বেশ বলিষ্ঠ গড়ন—মাথায় নিরঞ্জনের চেয়েও বেশ উঁচুও বটে, খাড়া নাক, পাতলা সুঁচলো গোঁফ, একটু টাক পড়া মাথা। কিন্তু হিন্দী ফিলমের ডাকাত সর্দারের মতো মনে হয়নি দেখে। পোষাকও ছিল সাদাসিদে। প্যাণ্টশার্ট পরনে—হ্যাঁ, টাই ছিল গলায়। বেশ ভদ্রলোক-ভদ্রলোক নিরীহ অফিসার চেহারা। অনু নিরঞ্জনের কথামত ওকে সমীহ করে চলছিল বটে, মনে মনে একটুও কিন্তু ভয় পায়নি। নিরঞ্জন মাঝেমাঝে বেশ রঙ চড়িয়ে গল্প বলে। এও তাই।

সেদিন সন্ধেবেলা যখন সাইকেলে চেপে এল, ডাকল, এবং বলল, নিরঞ্জনবাবু কিছু বলে গেছেন নাকি, অনু বলেছিল, হ্যাঁ। সমীর-

বাবুকে হাসপাতালে নিতে লোক আসবে। সে বলেছিল, ঠিক। আমিই নিতে এসেছি।

কিন্তু একটু অবাক হয়েছিল অনু। রিকশো নেই। সাইকেলে বসিয়ে নিয়ে যাবে?

সমীর—সেই ছেলেটি বলে গেল, আসি। ভুলব না বউদি। অনেক করলেন। কপালে থাকলে দেখা হবে।

অনু—কে জানে কেন, হঠাৎ গভীর আবেগে বলে ফেলেছিল, কপালে কেন? নিশ্চয়ই দেখা হবে। হাসপাতালে গিয়ে দেখে আসবো।

সমীর শুধু হেসেছিল। তারপর দেখা গেল, আরো কয়েকজন লোক এসে হাজির। ওরা ওকে ধরাধরিকরে বিছানা থেকে ওঠাচ্ছে, সেই সময় আচমকা···

গা শিউরে ওঠে দৃশ্যটা ভাবলে। হঠাৎ সুরু হয়ে গেল ভয়ঙ্কর একটা কাণ্ড। কান ফেটে গেল। সেই সাইকেলওলা লোকটা জানোয়ারের গলায় চেঁচিয়ে উঠল···সা···বা···ড়!

হ্যাঁ, তখন চিনতে পারেনি। এখন পারছে। স্মৃতির মধ্যে স্পষ্ট হয়ে উঠছে পান্নাবোস। কিন্তু সন্ধ্যার সেই ভয়ংকর মানুষটা নয়, সাদাপ্যান্ট শার্ট অফিসার চেহারা, ভদ্রলোক, অমায়িক হাসি —অন্য কেউ।

অনু চোখ বুজল। টাকাগুলো আর চিঠিটা আঁকড়ে ধরল। আগুন জ্বেলে পুড়িয়ে দেবে, নাকি তুলে রাখবে? শোধ করে দেবে বড়বাবুর টাকাগুলো? নাকি···চোয়াল আঁটো হয়ে গেল তার।

হঠাৎ সেই সময় রেখা চোখ খুলেছে। আলো থেকে চোখ বাঁচাতে হাত রাখল সে। বলল, কী ব্যাপার? বসে আছ যে!

কিছু না। শুই।

বলে অনু কাপড়ের ভিতর স্যাঁৎ করে হাতটা লুকিয়ে ফেলল এবং উঠে সুইচ টিপে বাতি নেভাল।

এবং সাবধানে এসে শুয়ে পড়ল। বালিশের নিচে ভরে দিল

টাকা আর চিঠি। তারপর ঠাণ্ডা নিঃসাড় সেই হাতটা রেখার গায়ে ফের রেখে বলল, ঘুমোও।

এক ঝলক আলো অন্ধকার চিরে বেরল এবং চিনুর পায়ের কাছে এসেই নিভল। চমকে উঠেছিল চিনু। পকেটে হাত ঢুকে গিয়েছিল অভ্যাসবশে। পরক্ষণে ফারুকের গলা শুনতে পেল সে—চিনু এলি?

উঁচু পগারের আকন্দ ঝোপ থেকে চষা ক্ষেতের ওপর হেঁটে আসছে ফারুক। চিনু বলল, তুই কী করছিস এখানে?

তোকে এগিয়ে নিতে। বলে ফারুক কাছে এসে দাঁড়াল।

সমু কেমন আছে রে?

এক রকম। পাটা ফুলেছে দেখে এলুম।···ফারুক পা বাড়াল। চল্, মাঠ হয়ে যাই। খবর খুব সিরিয়াস। বলছি।

কৌতূহল প্রকাশ করা চিনুর স্বভাব নয়। চষা ক্ষেতে দুজনে নামল। একটু পরেই বাঁ দিকে নদী পেল। নিঃশব্দে দুজনে ঢালু পাড় বেয়ে নেমে গেল। বালির চড়া পড়ে আছে—অন্ধকারে ঝকমক করছে চড়াটা। একপাশে একফালি জল তিরতির করে বইছে। নক্ষত্রের আলোয় ঝিকমিক করছে। স্রোত পেরিয়ে খাড়া পাড়ে উঠে গেল ওরা। সরকারী জঙ্গলটা ওখানে সুরু হয়েছে।

উত্তর দক্ষিণ লম্বা জঙ্গলের ধারে-ধারে অনেকখানি হাঁটবার পর সেটা শেষ হল। একটা ফাঁকা মাঠ পেল। চিনু বলল, এ কোথা দিয়ে যাচ্ছি রে আমরা?

ফারুক জবাব দিল, খুব ভাল জায়গা। নির্বংশতলার মাঠ। সামনে একটা পুকুর আছে, তার পাড়ে সেই বিখ্যাত ঠ্যাঙাড়ে বট-গাছটা।

কুখ্যাত বল্। একটু হাসল চিনু···সিগ্রেট খেতে ইচ্ছে করছে। কোথায় খাব ?

ফারুক ওর হাত ধরে টানল।···বটতলাই ভালো। ভুতের সঙ্গে মৌজ করা যাবে। চল্।

অনেকগুলো ঝুরি নামিয়ে দিয়ে কতকাল থেকে বেঁচে আছে এই বটগাছটা। ভিতরে গাঢ় অন্ধকার। এতক্ষণে টর্চ জ্বেলে ওরা তলাটা দেখে নিল। একটা মোটা শেকড়ের ওপর পাশাপাশি বসল। ফারুক সিগ্রেট বের করে বলল, নে। চারমিনার নয় কিন্তু। ক্যাপসটান।

চিনু সিগ্রেটটা নিল।···শালার নবাবী কারবার! জ্বাল্।

ফারুক লাইটার জ্বালল। পরস্পর ধরিয়ে নিল। তারপর হাসতে হাসতে বলল, ট্রাডিশান সমানে চলেছে, মাইরি।

কেন রে ?

নির্বংশতলায় এখনো সবাইকে আসতে হয় দেখছি।

চিনু হাসল।···আচ্ছা, একটা ব্যাপার আমি ভেবেই পাইনে। আগের দিনে গেম খেলতে লোকে এইসব গাছটাছ বেছে নিত—বেশির ভাগই কিন্তু বটগাছ। ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছিস কখনও ? ঠ্যাঙাড়েগিরি করবে—সেও বটগাছ খুঁজেছে। ডাকাতি করতে যাবে, তাদেরও রেঁদেভ্যু হল বটগাছ।

রেঁদেভ্যু আবার কী ? ফারুক জিগ্যেস করল।

মেলবার জায়গা দুপক্ষের।···চিনু হাসতে হাসতে বলল।··· মাইরি, বটগাছ যেন ঈশ্বরের মতো। পাপীতাপী পুণ্যবান সবারই আশ্রয়। নে, একটু ধুলো খা এখানকার।

বলে সে সত্যিসত্যি ধুলো তুলে জিভে ঠেকাল। ফারুক সশব্যস্তে বলল, আরে, ছি ছি। সব গুয়ে ভরতি। দিনের বেলা রাখালগুলো এখানে হাগে। ছ্যাঃ!

টর্চের আলোয় ফের জায়গাটা দেখে নিল ফারুক। তারপর আশ্বস্ত হল। কিছুক্ষণ দুজনে চুপচাপ সিগ্রেট টানতে থাকল।

ফারুক বলল, এবার বলি কথাটা। আগে তোরটা শুনে নিই বরং। দিয়ে এলি টাকা? নিলে?

চিনু বলল, নেওয়া-নেওয়ির প্রশ্ন নেই। পান্নাদা বলেছিল, খামটা দরজা বা জানালার ফাঁক গলিয়ে ফেলে দিতে। ওরে ব্বাস! ষ্টেশনে নেমেই দেখি, কড়া পাহারা চাদ্দিকে। পান্নাদা এত সব ভাবেই নি! আমিও ভাবিনি। আজকাল তো সবখানেই এমন হ্যাঙ্গামা হচ্ছে। নেহাৎ রুটিন ডিউটি দিচ্ছে-টিচ্ছে পুলিশ। কিন্তু ষ্টেশন থেকে বেরিয়ে দেখি সব উল্টো। যাই হোক, স্মার্টলি হেঁটে গেলুম। তাড়া খেলে গা বাঁচানোর মতো ঝোপঝাড় জঙ্গল অনেক। তবে সবই তো জানা আছে রে বাবা! রাত সাড়ে বারোটায় তখন ওদের চোখ টানছে। খেয়াল করল না কেউ। আর জানলাটাও খোলা পেয়ে গেলুম।

ফারুক বাধা দিল।...ভুল ঘরে ফেলিস নি তো?

উঁহু। বুগানভিলিয়ার ঝোপের ধারে যে জানালাটা। আমার মনে ছিল।

কোন সাড়া পেলিনে?

না। অত লক্ষ্য করার সুযোগ কোথায়? ফেলে দিয়েই ঝোপে গা ঢাকা দিলুম। যা হুকুম ছিল, ব্যস, তাই।

ফারুক হঠাৎ গম্ভীর স্বরে বলল, নতুন হুকুম এসেছে তারপর। সাড়ে বারোটার ট্রেনে তোর সঙ্গে আমার ষ্টেশনে মিট করার কথা। হল না। এত দেরীতে খবর দিয়ে গেল মিষ্টার। হাঁফাতে হাঁফাতে দৌড়চ্ছি। দেবীবাবুর খামারের কাছাকাছি যেতেই ট্রেন চলে গেল। সাইকেল নিলে ভাল করতুম। যাক্ গে। ততক্ষণে তো তুই খামটা দিয়ে বসে আছিস। কী আর করা যাবে?

চিনু গুম হয়ে বলল, আবার নতুন হুকুম্ কী?

খামটা দিতে বারণ করেছিল পান্নাদা।

কেন বল্ তো?

নিরঞ্জনবাবু পান্নাদার নাম করে দিয়েছে।

এ্যাঁ। সত্যি ?

হ্যাঁ। পান্নাদার আজ রাত্রে সমুকে দেখতে আসার কথা ছিল। তারপর ওকে নিয়েও যেত। গাড়ির ব্যবস্থাও হয়েছিল। কলকাতা নিয়ে গিয়ে একটা নারসিং হোমে সমুর অপারেশন হবার কথা। সব বানচাল হয়ে গেছে। পান্নাদা গা ঢাকা দিয়েছে। এদিকে হাতেম চৌধুরীর বাড়ি ঘনঘন পুলিশ আসছে আজ। আমিও গা ঢাকা দিয়ে রয়েছি। চৌধুরী তাড়া দিচ্ছে, সমুকে শিগগির এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাও। নয় তো কেলেঙ্কারী হয়ে যাবে।

চিনু চুপচাপ শুনছিল। এবার শুধু বলল, ও।

কিন্তু চৌধুরীর মেয়ে নাজমা—নাজমাকে চিনিস ? দেখেছিস হয়তো। যাক্‌গে। নাজমা কী ওয়াণ্ডারফুল সারভিস দিচ্ছে মাইরি, ভাবা যায় না। সমুর কপাল রে। ওদিকে দেবী ব্যানারজির মেয়ে সুশি—সে নাজমার বন্ধু।···

চিনু কথা কাড়ল।···সুশিকে আমি চিনি। সমুর সঙ্গে কী যেন আছে।

থাকবে। সমুটার কপাল আমাদের মতো টস্ খাওয়া নয়।

সুশি জানে নাকি সব ?

জেনেছে। একটা ভুল হয়েছিল আমাদের—মানে আমারই। ভেবেছিলুম, নাজমা হাজার হোক, শিক্ষিত মেয়ে—সমুর দেখা-শোনাটা ভালই করবে। ওকে চালাকি করে বলেছিলুম, সমু একজন নকসাল। ব্যস, নাজমার ইনটারেষ্ট বেড়ে গেল। তারপর সুশিরও।

সমু নকসাল বলেছিলি ?

হ্যাঁ। কী আর বলব ?

চিনু একটু চুপ করে থেকে বলল, যাঃ। তোর কোন সেন্স নেই।

কেন শুনি ?

ফারু, তোর শক্তি আছে যথেষ্টই—স্বীকার করি। কিন্তু ভারি

মোটা বুদ্ধি তোর। স্রেফ ছেলেমানুষ তুই। কেন ওকে নকসাল বলে পরিচয় দিলি? কোন মানে হয়?

যা হয়ে গেছে, গেছে। ফারুক গম্ভীর হয়ে বলল।...এবার কী করি, সেইটেই কথা। পান্নাদার সঙ্গে যোগাযোগ করা এবার কিছুদিন কঠিন হবে—পাত্তাই পাবো না।

চিনু ফের ক্ষুব্ধভাবে বলে উঠল, কেন ওকে নকসাল বললি তুই?

ফারুক একটু অবাক হল। ঝাঁঝের সঙ্গে সে বলল, কী হয়েছে তাতে শুনি? নাঃ, তুই বড্ড বেশি বলছিস চিনু। আমার এলাকা। এখানে কী লাইনে চললে কী হয়, সেটা আমিই ভাল বুঝি। আজকাল সব জায়গাতেই এই কথাটা বেশ দাম পাচ্ছে। গাঁয়ের সাধারণ লোকেরা ওদের সম্পর্কে বেশ সমীহ করে ভাবছে-টাবছে। তাই ভেবেছিলুম, তেমন গুরুতর কিছু হলে অনেক সাহায্য পাব লোকেদের কাছে। অন্তত পুলিশের খপ্পরে সমু সহজে পড়বে না। গাঁয়ের এসব লোককে তুই চিনিস নে চিনু, তুই শহরের ছেলে। এরা খুব সহজেই কিছু বিশ্বাস করে বসে এবং তার জন্যে ঝোঁকের বশে জান দিতেও পারে। এদেরকে হাত করা খুব সোজা।

চিনু বিরক্ত হয়ে বলল, থাক্। বক্তৃতা থামা।

ফারুক সিগ্রেটটা ঘষে নিভিয়ে দিল। কোন কথা বলল না।

চিনু ডাকল, ফারু! রাগ করলি?

আমার রাগটাগ নেই। আমার গায়ে সাপের রক্ত।

ওই ছুঁড়িদুটোকে নিয়েই যত ঝামেলা। সব তো শুনেছি রে বাবা! ষ্টেশনকোয়াটারে ওরা সমুর খোঁজে গিয়েই তো ব্যাপারটা এ্যাদ্দূর গড়াল। ফের এখানে তুই ওদের...যাঃ!

ছুঁড়ি-ছুঁড়ি করছিস—শুনছি। কিন্তু মনে রাখিস, ওদের বাবারা এলাকার নামজাদা লোক। পান্নাদার এই অবস্থা। এখন দরকার হলে ওঁদের সাহায্য আমরা পেতে পারি—অন্তত সমুর ব্যাপারে তো বটেই।

হাতেম চৌধুরীকেও বলেছিস বুঝি—সমু নকসাল?

সে পান্নাদার চেনা লোক। পান্নাদাই তার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল। আমি নই।

চিনু অন্ধকারে মাটি থেকে কী একটা তুলে মট করে ভাঙল এবং ছুঁড়ে দিয়ে বলল, শালা পুঁচকে ওয়াগানব্রেকার—হারামী মস্তান কোথাকার—তাকে বানালে নকসাল। ছ্যা ছ্যা!

ফারুক চাপা হেসে বলল, সমুর ওপর তোর এত রাগ কিসের?

চিনু জবাব দিল না।

বুঝেছি—রাগও নয়। হিংসে।

হিংসেটিংসে নেই।

নেই আবার? আমারই হচ্ছে। দু দুটো ডব্‌কা মাল তার দুপাশে বসে···ইস্! ভাবা যায় না। শালা দিব্যি শহীদের বাচ্চা হয়ে যাবে মাইরি। যদি মরে, দুজোড়া চোখের অন্তত দু ফোঁটা জলও পেয়ে যাবে। আহা!···কিন্তু আমরা? গুলিটুলি খেয়ে যদি মরেই যাই, কুকুরে মুতে যাবে মুখে। তারপর শুওরের ধাড়ি পান্নাদা ঠাণ্ডা মাথায় গলায় চাকু চালাবে—ইনদার মত। ঔঃ!

ওঠ। সমুর কাছে যাব। চিনু উঠে দাঁড়াল।

ফারুকও উঠল। পা বাড়িয়ে টর্চ জ্বালল সাবধানে। বলল, চল্। আজ আর ঘুমই বরাতে নেই। ফিরবি কোন ট্রেনে? এ ষ্টেশনে আর যাস্ নে। আগের ষ্টেশনে ভোর পাঁচটায় গাড়ি আছে। তোকে সাইকেলে করে পৌঁছে দিয়ে আসব। তারপর কারো বাড়ি গিয়ে ঘুমোব। নিজের বাড়িতে নিশ্চিন্তে ঘুম হবে না রে!

ওরা মাঠ পেরিয়ে পায়রাডাঙার দিকে এগোতে থাকল অন্ধকারে। দূরে শান্টিং ইয়ার্ডে একটা খালি এঞ্জিন ঘুরঘুর করছে। হুইসলের আওয়াজ আসছে বারবার। অজস্র আলোর ফোঁটা ঝিকমিক করছে। ফাঁকা মাঠে চৈত্রের হাওয়া বয়ে যাচ্ছে হু হু করে। কতরকম গন্ধ, কতরকম শব্দ এইসব পাড়াগেঁয়ে রাত্রির পৃথিবীতে। যেতে যেতে চিনু একবার বলল, টাকাগুলো জলে ফেলে দিয়ে এলুম। নিজে মেরে দিলেই পারতুম।

সাত

সেরাতে বাবার কাছে একটা কৈফিয়ৎ নেবার জন্যে প্রস্তুত হয়েছে নাজমা। হাতেম চৌধুরী তখনও দেবীবাবুর ফার্ম থেকে দাবা খেলে ফেরেন নি। নাজমা দোতালার বারান্দায় তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছিল।

মা নীচের ঘরে রয়েছে। স্বামী না ফিরলে খাবে না। গজগজ করা মায়ের অভ্যাস।...এত বারণ করব, তবু কি হুঁস আছে মানুষের! দিনকাল খারাপ। কার মনে কী আছে। একা এত রাতে মাঠের মধ্যে দিয়ে আসবে—কী আক্কেল! আবার লোক পাঠালে হুজুরসায়েব বাড়ি ফিরে চোখ রাঙাবেন! যেন কেনা বাঁদী আমি।...যাক্ গে, যাক্ গে। আমার কী? ও সোলের মা, শুলে নাকি? তোমার আবার শুলেই ঘুম। এস না বাছা, খানিক লুডো খেলি ততক্ষণ। মিয়া কখন ফেরেন, ছাখো।

লুডো খেলবেন মাজি?...সোলের মার গলা পাওয়া গেল।... সাপলুডো? আমার কপাল! সব গুটি মুখ দিকে ঢুকে লেজে চলে আসবে আমার—হিঃ হিঃ হিঃ! বরং নাজমাকে ডাকি। অ নাজমা!

মা ধমক দিল। গলা ফাটিও না বাপু। নাজমার পড়াশোনা আছে।

ওপরে নাজমা মুখটিপে হাসল। সবে কলেজ খুলেছে। পড়াশোনা শুরু হয়নি। তারওপর হাঙ্গামা লেগেই আছে। ল্যাবরেটরী পুড়িয়ে দিয়েছে। হাতেম চৌধুরী মৌরীগ্রাম কলেজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং কর্ণধার। নকসালদের ওপর তাঁর রাগের শেষ নেই অথচ সমু—সমুকে তিনি আশ্রয় দিয়েছেন। এটাই

রহস্য। বাবার কাছে ব্যাপারটা জেনে নেবার জন্যে নাজমা এবার অধৈর্য হয়ে উঠেছে। উঃ বাবার পেটে পেটে এত। ফারুদা না বললে তো জানতেই পারতনা সে।

নীচে সোলের মা হাসছে। অই, অই। হল তো? বললুম না, সাপে গিলবে। গিলল তো। আমার কপাল।

…সমুর জ্বর বেড়েছে। পা ফুলে উঠেছে। ওর ভারি কষ্ট হচ্ছে। ভুল বকছিল। মাকে ডাকছিল। আহা, বিপ্লবের জন্যে বুঝি এত কষ্ট সইতে হয়। কিন্তু সত্যি সত্যি বিপ্লব ব্যাপারটা কী? দুনিয়াটা বদলে যাবে, এই তো? সেটা অবশ্য ঠিকই। দুনিয়াটা ঠিক মনের মত নয়। দুনিয়ার এত অশান্তি, বদমাইসি, ফাঁকি, মুখোসের কারবার। এমন একটা দুনিয়া মানুষের জন্যে দরকার—যা শান্ত, সুন্দর, প্রবঞ্চনাবিহীন, ভালবাসার মতো। নাজমার চোখে এই ছবিটা আছে। এই ছবি কেমন করে সে আঁকল, হিসেব করে বলতে পারবে না। এটা আঁকা হয়ে গেছে—এই হল সত্য। প্রথম যেদিন সে বন্দুকের একটিপেই দুটো হরিয়াল মারতে পেরেছিল, সেদিনই সে টের পেয়েছিল, তার নিজের মধ্যে কী একটা ভয়ঙ্কর শক্তি আছে—যা সাজানো গোছানো আপাতসুশৃংখল দুনিয়াটাকে তছনছ করে ফেলতে পারে। শিউরে উঠেছিল নাজমা। প্রতিবার ট্রিগারে আঙুলের চাপ, প্রতিবার বিস্ফোরণ, বারুদের কটু গন্ধ, উচ্চকিত প্রাণী ও প্রকৃতির জগত, শিহরণ, আলোড়ন এবং যেন একটা মুক্তির আনন্দ। জ্বলে উঠে সীসের বলসমেত একটা বারুদের পিণ্ড যেমন ইস্পাতের ঠাণ্ডা নল দিয়ে মুক্তির আনন্দ পেতে পেতে ছুটে যায়।

সমুও কি এমনি একটা মুক্তির স্বাদ পেতে চেয়েছিল? আজ ভুল বকার সময় সমু বেশ কয়েকবার 'লাল ফুল' কথাটা বলছিল। সে কি ওর দলের কোন সাংকেতিক কথা? নাজমা দূর অন্ধকার আকাশের দিকে তাকিয়ে লাল ফুল দেখতে পাচ্ছে এখন—গুচ্ছ গুচ্ছ লাল ফুল চাদ্দিকে ভরে উঠেছে, ফুটে উঠছে, ছড়িয়ে পড়ছে

নক্ষত্রপুঞ্জের মতো উল্কাপাতের মতো—সৃষ্টির গভীরতম কেন্দ্র থেকে বিস্ফোরণ ঘটেছে যেন। চোয়াল আঁটো হয়ে এল। মুঠো হয়ে এল হাত দুটো। নাজমা প্রতিমুহূর্তে অনুভব করতে থাকল, একটা কিছু করা দরকার। রক্তে প্রস্তুতি সুরু হয়েছে। পরিণতি আসন্ন। এখন তার ভূমিকাটা অনিবার্য হয়ে উঠছে ক্রমশ। স্পষ্ট হচ্ছে। সমু মরে গেলে সে পৃথিবীকে ক্ষমা করতে পারবে না। সে একটা কিছু করে ফেলবেই ফেলবে।...

বাইরে দূরে মোটরবাইকের আওয়াজ ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছিল। এক ঝলক আলো বারবার শিসিয়ে উঠছিল গাছপালের শীর্ষে। হাতেম চৌধুরী আসছেন।

সামনের পাঁচিলঘেরা প্রাঙ্গণে হেরিকেন হাতে দৌড়ে গেল সুলতান। গেটটা খুলে একপাশে দাঁড়াল। হাতেম চৌধুরীর গাড়িটা জোরে এসে ঢুকল। অন্দরের দরজায় হাতেমের গলা শোনা গেল, নিকড়ি! ওরে নিকড়ে! ঘুমিয়ে পড়লি ব্যাটা? ওঠ। নে—গাড়িটা মুছে ফ্যাল্। যা ধূলো হয়েছে, বাপ্‌স!

নীচের ঘরে তন্ময় হয়ে লুডো খেলছে ওরা। হয়তো টেরই পেল না। সিঁড়িতে জুতোর শব্দ হল। হাতেম চৌধুরি উঠে আসছেন।

নাজমা সরে যাচ্ছিল। হাতেম বললেন, ঘুমোসনি নাজু! ব্যাপার কী?

নাজমা কোন জবাব দিল না।

চিবুকে ঠোনা মেরে মেয়েকে আদর করলেন হাতেম।...রাগ করেছিস নাকি? মায়ের সাথে? দাঁড়া, আসছি।...বলে কাপড় চোপড় বদলাতে ঘরে ঢুকে গেলেন হাতেম।

ভিতর থেকে ফের বললেন, খাওয়া হয়েছে তো?

নাজমা এদিকে তৈরী। সোজা ঘরে ঢুকে নিষ্পলক তাকাল কয়েকমুহূর্তে। হাতেম একটু চমকে উঠেছিলেন। দুপা এগিয়ে এলেন। নাজমা বলল, ও কে?

কার কথা বলছিস?

ওই যে ছেলেটি—মঘাচাচার ঘরে যাকে লুকিয়ে রেখেছ ?

হাতেমের চোখদুটো একটু উজ্জল দেখাল—তারপর হেসে উঠলেন।...তুই জেনে ফেলেছিস বুঝি ? আরে ও একটা ফালতু ছেলে—বদমাইসী করতে গিয়ে জখম হয়েছে। তুই তো জানিস, সম্পত্তি মান ইজ্জত রাখবার জন্যে আজকাল অনিচ্ছাসত্বেও অনেক কাজ করতে হয় আমাদের! এও তাই।

নাজমার ঠোঁটে একটুখানি হাঁসির কুঞ্চন দেখা গেল—সেটা অবিশ্বাসের।

আমার নাম হাতেম আলি চৌধুরী—তাই না ? হাতেমতাই এর নাম শুনেছিস—সেই দাতা হাতেম ? দেবী আমাকে ঠাট্টা করে দাতা হাতেম বলে। কাজেই...ছেড়ে দে ওকথা। যে যুগ পড়েছে—যখন হাতে দায়দায়িত্ব পড়বে, তখন তোকেও দেখবি কত বিচ্ছিরি কাজ করতে হবে।... যা, ঘুমো।

ছেলেটি তো নকসাল।

হো হো করে হেসে উঠলেন হাতেম। নকসাল! যাঃ! কে বলেছে তোকে ? মঘা ? মঘা জানে নকসাল কাকে বলে ? ব্যাটা কোথায় কার কাছে নকসাল কথাটা শুনেছে—শুনে ভেবেছে, নকসাল মানেই তার সাগরেদ। যতঃসব।

আমাকে ফারুক বলেছে।

ফারুক!...হাতেমের মুখটা গম্ভীর হল।

হ্যাঁ।

তুই দেখেছিস ছোকরাটাকে ? গিয়েছিলি নাকি মঘার ঘরে ?

গিয়েছিলুম।

অন্যায় করেছিস। ফারুক একটা গুণ্ডা—তার বন্ধু কেমন হবে, এও তোর মত এজুকেটেড মেয়েকে বলে দিতে হবে ? আর কখনো যাবি নে ওখানে—আমার মানইজ্জত নিয়ে কেলেঙ্কারী হবে এতে, জানিস ? ছিঃ! তুই কেন ওর মধ্যে মাথা গলাচ্ছিস ?

নাজমা জেদের সাথে বলল, তুমি জানো না। ছেলেটি শিক্ষিত

—ফারুদার মতো আজেবাজে মস্তান নয়। একজন গুণ্ডা ওসব কথা ভাবতেই পারে না। মডার্ণ সিসটেম অফ হিউমান সোসাইটি সম্পর্কে কোন গুণ্ডার কোন ধারণা নেই, চিন্তাভাবনা থাকা তো দূরে।

ওর বুদ্ধি আছে?

আছে। ওর কথার মধ্যে লজিক আছে। পরিচ্ছন্ন দৃষ্টিভংগী আছে। তাছাড়া···

হাতেম কঠোর মুখে বললেন, ছেলেটি আসলে একজন ওয়াগান ব্রেকার। পান্না বোসের নাম তুই জানিসনে সম্ভবত। এদিকের রেল লাইনের যত রকম বদমাইসি হচ্ছে, ও তার আসল পাণ্ডা। তোকে বলাটা দরকার মনে করিনি তখন—কিন্তু এখন করছি। ফারুক এটা ঠিক করেনি। এই ছেলেটি পান্নাবোসের একজন চেলা। সেরাত্রে রেলইয়ার্ডে যে ওয়াগান ব্রেকিংএর হাঙ্গামা হল—তাতেই ও পায়ে গুলি লেগে জখম হয়েছিল। তুই তো জানিস, ফারুকে আমার দেখতেই হয়। ফারুকের গুরু পান্না। আমার অবস্থাটা বুঝে ছাখ।

তুমি সত্যি বলছ তো?

হাসা উচিত ছিল—কিন্তু হাসলেন না হাতেম।···নাজু, আমি শরীয়তের খেলাপ করে তোকে স্বাধীনতা দিয়েছি। কিন্তু মনে রাখিস, সব জিনিসই হাতে রেখে খরচ করতে হয়। চাঁদসুলতানা যাই হোক, আসলে সে মেয়ে ছিল। আমি তোকে ছেলেবেলা থেকে চাঁদসুলতানার গল্প শুনিয়ে আসছি। চাঁদসুলতানা হবি তুই, এ ছিল আমার স্বপ্ন।···

নাজমা ফুঁসে উঠলা···বেশ তো, বোরখা পরিয়ে ঘরে রেখে দাও। অসূর্যম্পশ্যা হয়ে থাকি। লেখাপড়া ছাড়িয়ে দাও। দাদু যেমন তাঁর বউবিবিকে করে রেখে গেছেন।

সেটা আলাদা ব্যাপার।···হাতেমের গাম্ভীর্য ঘুচল না।···একটা কথা তোর বোঝা উচিত নাজমা। হিন্দুমেয়েরা আজ যে সাহস বা ক্ষমতা দেখাচ্ছে, তা তোর নেই। ওদের নকল করতে গেলেই সেটা

হবে তোর বোকামি। তোর একটা লিমিট আছে। দেবীর মেয়ের অনেক ছেলেবন্ধু থাকবে—দেবী তাদের নিঃসঙ্কোচে এনটারটেন করবে—কিন্তু হাতেম চৌধুরীর পক্ষে তা অসম্ভব। এটা আমার গোঁড়ামি বলবি, বল। কিন্তু আমার এ কথার পিছনে সত্য আছে—আমার সংস্কার আমাকে বেশিদূর এগোতে দেবেই না। অন্তত হিন্দুদের মতো কয়েকটা জেনারেশন যেতে দে, তারপর যদি মুসলিম সমাজ সেরকম ফ্রি হতে পারে—পারবে। অন্তত আজ নয়।

এতসব আমাকে বলার কারণ কী?…নাজমা রাগে মুখটা অন্যদিকে ফেরাল। খাটের বাজু শক্ত করে ধরে রইল। ফের বলল, তাহলে কেন এমন করে ফ্রিলি চলাফেরা করতে দিয়েছিলে?

হাতেম পিঠে হাত রাখলেন।…হয়তো ভুল করিনি। কিন্তু আমি চাইনে যে আমার মেয়ে নকসাল হোক।

কে নকসাল হয়েছে? নাজমা মুখ ফেরাল। তার কান্না পাচ্ছে এবার।

সে কথার জবাব না দিয়ে হাতেম বললেন, আমি কেন—প্রতিটি বাবার সামনে এই আতঙ্ক। আমি ব্যতিক্রম হবো কোন সাহসে? দেবী বলছিল, তার মেয়েকে নিয়ে সেও দুর্ভাবনায় পড়েছে। ভাবছে, মফঃস্বলের কলেজে এনে পড়াবে নাকি। কিন্তু সবখানেই তো ওই। সময়ের হাওয়ায় যেন মহামারীর বীজ রয়ে গেছে। আজ ভাবছি—

নাজমা বাধা দিয়ে বলল, লেখাপড়া না শিখতে দিলেই ভালো হত—তাই না?

হাতেম হাসবার চেষ্টা করলেন।…যা, ঘুমো গে। রাত হয়েছে। আর—ওসব নিয়ে ভাবিসনে। ছোঁড়াটার একটা ব্যবস্থা শিগগির করে ফেলছি। কথা ছিল—পান্না ওকে একরাত থাকার পর পরদিনই নিয়ে যাবে। হঠাৎ সন্ধ্যাবেলা শুনলুম, মৌরীগ্রাম স্টেশনের ছোটবাবু পান্নার নাম করে দিয়েছে পুলিশকে। পান্না এখন গা ঢাকা দিয়েছে। ফারুকও লুকিয়ে পড়তে চায়। ওদের দলের সবাই তো এখন নিজের

নিজের মাথা বাঁচাতে যে-যেদিকে পারে, সরে পড়েছে। মাঝখান থেকে এই ছোকরা পড়েছে মুসকিলে। কদ্দিন এমন করে রাখা যাবে? জানাজানি হতে বাধ্য। মরে টরে গেলেই বরং ঝামেলা চুকে যেত। লাসটা পুঁতে ফেলতুম!

নাজমা অবাক হয়ে বাবার মুখের দিকে তাকাল। চাপা হাসছেন হাতেম। এ মুহূর্তে তার পৃথিবীর সবচেয়ে প্রিয় মানুষটিকে কী হিংস্র আর কুটিল দেখাচ্ছে! একে ঘৃণা করতে বাধে না নাজমার।

নাঃ মরবে না। এত সহজে শয়তানের প্রাণ তো যাবে না। আজরাইলও ঘেমে ওঠে।...বলে হাতেম পা বাড়ালেন। ফের ঘুরে বললেন, খেয়েছিস না খাসনি?

বাইরে কখন এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন চৌধুরীগিন্নি। কাঠ হয়ে শুনছিলেন। এবার নেমে গেলেন ভয়ে ভয়ে। মেয়ে যে মঘার ঘরে গেছে—শুধু যাওয়া নয়, রীতিমত ছেলেটির খাওয়া দাওয়া সেবাশুশ্রূষা ইত্যাদিও করছে তিনি জানেন। বাপের অবাধ নাই-দেওয়া মেয়ের বিরুদ্ধে কিছু বলার ক্ষমতা তো তাঁর নেই-ই, উপরন্তু নাজমার চেহারা চলাফেরা কথাবার্তা—সবকিছুই তাঁর কাছে প্রশংসা করার মত বিস্ময়কর। মাঝেমাঝে বিশ্বাস হয় না, নামাজকে তিনি পেটে ধরেছিলেন!

নাজমার কাছে ছেলেটির কথা শুনেশুনে তাঁর তীব্র ইচ্ছে করছিল, একবার গিয়ে দেখে আসবেন চুপিচুপি। আহা, কোন মায়ের প্রাণের বাছা এমন করে জঙ্গলে ভাঙাঘরে যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে! কেন এপথে পা বাড়িয়েছিলি মাণিক আমার? খোদার এত বড় দুনিয়াটা যেমন চলছে তেমনি চলবে, তুই নাদান বান্দা একজন—তোর সাধ্য কী তা বদলে দিতে পারিস?

আর কি চোখের দেখাটাও হবে ওর সাথে? বড় সাধ থেকে গেল মনে।

সমু স্বপ্ন দেখছিল। কোণে ভাঙা হারিকেনটা মিটিমিটি জ্বলছে। তার ফাটা কাচে ঘন কালি জমে আছে। তলা দিয়ে একচিলতে আলো পড়ছে মাত্র। সমু স্বপ্ন দেখছিল, সে পালাচ্ছে। পিছনে তাড়া করে আসছে পুলিশ। সে গেঙিয়ে উঠিল। তারপর জাগল। চোখ খুলেই তার বুকটা ধড়াস করে উঠল। ওই আঁবছা অন্ধকারে লোকটা কে বসে আছে? কী ভয়ঙ্কর ওর চেহারা। একদিকে একটা ওল্টানো সাদা চোখ—অন্যদিকে নিষ্পলক আরেকটা—তীব্র, জ্বলন্ত দৃষ্টি। সমু চেঁচিয়ে উঠল, কে, কে?

মঘা হাসল ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে। ··আমি গো, আমি ছোটবাবু। ডর পেল নাকি?

তুই কী করছিস শুওরের বাচ্চা?

মঘা আর রাগ করছে না। পান্নাবাবুর ছোট ভায়ের মাথা খারাপ হয়ে গেছে। হবার কথা। এত কষ্ট, জ্বর, বেজায়গায় শুয়ে থাকা। হাজার হলেও ভদ্রলোকের ছেলে। আজ কখন থেকে ও তাকে অকারণে যাচ্ছেতাই গালগালি করছে। প্রথম প্রথম মঘা, 'চোপ। বাজে বকোনা' বলেছে—তারপর আর কান করছে না। জ্বরের ঘোরে ভুল বকছে। বকুক। তাই মঘা ফের হাসল।

এই উল্লুক, শুনতে পাচ্ছিস, কী বলছি?

বসে আছি বাপু। ঘুম আমার হয় না।

খবর্দার, অমন করে তাকিয়ে থাকবি নে—আমি যখন ঘুমোবো।

তোমাকে দেখছি ছোটবাবু।

কেন দেখবি শালা?

দেখবার মত জিনিস হলেই ছাখ গো। তাই দেখছি।

শালাকে কুকুরের মত গুলি করে মারব। শুয়ে পড়্।

হিঃ হিঃ হিঃ।

হাসি? তোর বাকি চোখটা কানা না করলে চলবে না। থাম্। ···সমু হাত বাড়িয়ে বালিশের তলা খুঁজল। তারপর চেঁচিয়ে উঠল,

আমার গানটা কে নিলে? এই (অশ্লীল)…'এর ভাই ডাকাত। আমার গান কই? দে—এক্ষুনি দে বলছি।

ফারু লুকিয়ে রেখেছে গো। আসুক, তাপরে নিও—যদি ভাল বোঝ, গুলি মেরো আমাকে।

ফারু একটা বাসটার্ড।

উঁ?

ফারু জারজ। কুত্তার বাচ্চা।…বিড়বিড় করে গাল দিচ্ছিল সমু। …আর পান্না—পান্নাবোসের জন্ম হয়েছে খেঁকশিয়ালের বীর্যে। পান্নার বাপ তখন ঘানি টানছিল। উরে শালা! কী ছেলের জন্ম হয়েছিল ভাবা যায় না। জানিস রে কানা শয়তান? হিকির কেপ্ট্ আছে রিপন ষ্ট্রীটে—খাসা মাল মাইরি! সে আবার বড়বড় হোটেলে নাচেগায়। মাগীর পাছার দোলা দেখে মডার্ন সিভিলাইজেশন কুত্তার মতো লেজ নাড়ে। খানকিরা কোটি কোটি হিজড়ের জন্ম দিচ্ছে আজকাল। কোটিকোটি হিজড়ে কোরাস গাইছে। টেবলু একটা পদ্য লিখেছিল—'রাজার বাজারে'…

রাজার বাজারে আজ মাংসের বেহদ্দ ছড়াছড়ি
রাজার লোকেরা আজ কসাইদের গারদে পুরেছে
লেলে বাবু ছেছে আনা দাম নিয়ে নেই কড়াকড়ি
হিজড়েরা দোলায় পাছা মদন মূরছে…

…মঘা, হিকি হিজড়ে, পান্না বোস হিজড়ে। হিকির মাগীকে হাতাবে বলে পান্না বোস হিকির সঙ্গে ভাব করেছে। এদিকে পান্না হিজড়ে। বুঝলি?…লে হালুয়া!

ছোটবাবু, এট্টু থামো বাবু।

চো-ও-প ভূতের বাচ্চা! আমার দিকে তাকাবিনে বলে দিলুম।

কথা কয়ে তো কষ্ট যাবে না গো। কিসে তোমার কষ্ট, সে কি বুঝিনে? তোমার বেথাটা পায়ের লয়, মোনের।

সমু চোখ বুজল। সেই স্বপ্নটা কি আর দেখা যাবে না? সুশির সঙ্গে সে হেঁটে যাচ্ছে কোথায়। নাজমা বলছে, আমিও যাবো।

কোথায় যেত সবাই মিলে? যাওয়া হল না। স্বপ্নটা এত ছোট ছিল। সুখের স্বপ্ন ছোট হওয়া উচিত নয়। কোথাও যেন অফুরন্ত সুখের স্বপ্ন জমা আছে বিশাল একটা সঞ্চয়কক্ষে। হঠাৎ কে দরজা খুলে দ্যায়। কিছু বেরিয়ে আসে। সেই বিশাল কক্ষের দিকেই কি সব মানুষের যাত্রা?

তার চোখ খুলতে ভয় হল। মঘা একচোখে তাকিয়ে আছে এখনও? তাকে দেখছে? সে চোখ বুজে থেকে বলল, মঘা, শুয়েছ?

শুই। মেজাজ সুস্থ হল ছোটবাবু! এবার তুমিও ঘুমোও।

মঘাদা, তোমার হাতটা দেখি।

কেন গো?

কাছে এস। তোমার হাত দেখব। আমি হাত দেখা জানি। কই, দাও।

লে কাণ্ড!

মঘাদা, এস না! হাতটা দাও। আর, দম উস্‌কে দাও আলোর। চোখ খুলে ওর থ্যাবড়া হাতটা তুলে নিল সমু। বলল, আলোটা তুলে ধরো।

মঘা আলো তুলে ধরল। কী দেখছ ছোটবাবু?

সমু নিজের হাতটা ওর হাতের পাশে রেখে কররেখা মেলাচ্ছে। বলল, মঘাদা, তোমার সঙ্গে আমার অনেক তফাৎ। যাও!

মঘা সরল না। না ছোটবাবু, ভাল করে দ্যাখো। তুমি মানুষ খুন করেছ, আম্মো করেছি। তুমি ডাকাতি করেছ, আম্মো করেছি। তাহলে? হাত তো একই হবার কথা। দ্যাখো, নেকনগুলো পড়ে দ্যাখো। মিলে যাবে। গোড়াটা মিললে পরেরটাও কি মিলবে না?

সমু চোখ তুলল। অল্প আলোয় তার মুখের খুব কাছে ওই মুখটা —মোটা নাক, খোঁচাখোঁচা গোঁফদাড়ি, বীভৎস! একদিকে নিষ্ঠুরতম অন্ধতা, অন্যদিকে তীব্রতম দৃষ্টিবত্তা। সে শিউরে উঠে ফেলে দিল হাতটা। চেঁচাল—সরে যা শয়তানের ধাড়িটা! পালা শিগগির!

বিরসমুখে সরে গেল মঘা। কোণে গিয়ে একটা আধপোড়া বিড়ি জ্বালতে থাকল হেরিকেনের কাচ তুলে।

সমু ছটফট করছিল।···কেন আমাকে এখানে রেখে গেল ওরা? খানকির বাচ্চাদের আমি সাবাড় করে ফেলব। খানকির বাচ্চা ফারুককে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে কাটব। খানকির বাচ্চা পান্নার পাঁজর ছাড়িয়ে ফুসফুস বের করব। আর, তুই খানকির বাচ্চা মঘা, তোর ওই চোখটা···

মঘা বাঘের মত গর্জাল হঠাৎ···চোওপ বেতমিজ। টুঁটিটা টিপে দোব শালার। যতবড় মুখ নয়, ততবড় কথা। শুনেই যাচ্ছি তখন থেকে—উঃ। কী ভেবেছে এই এক আঙ্গুলে হারামীটা।

বাইরে থেকে ফারুকের গলা পাওয়া গেল—এই মঘাচাচা, কী হচ্ছে?

ফারুক—তার পিছনে চিনু। মঘা বলল, তখন থেকে কেবল যা মুখে আসে, তাই বলে গাল দিচ্ছে। মেজাজ কতক্ষণ ঠিক থাকে?

চিনু সমুর পাশে বসে বলল, সমু, কেমন আছিস?

সমু চিনুর দিকে একবার তাকাল মাত্র। ফারুককে বলল, ফারু, আমার টিপ কোথায় রেখেছিস?

ফারুক বলল, আছে, ভাবিসনে। এই ছাখ, চিনু এসেছে।

পান্নাদা এল না?

না।

আসবে না?

দেরী হতে পারে। বলছি।

চিনু বলল, সমু, কথা বলছিস না যে?

সমু জবাব দিল না। ফারুক ক্ষুব্ধমুখে বলল, কী বিচ্ছিরি অবস্থায় না পড়া গেল মাইরি। সমুর কোন ব্যবস্থা করা যাচ্ছে না। কাছাকাছি অপারেশনের যোগাড় হতে পারে এক মৌরীগ্রাম হাসপাতালে। কিন্তু সেখানে যাওয়া মানেই তো বাঘের মুখে পড়া।

কলকাতা নিয়ে যেতে পারলে অবশ্য ভাবনা ছিল না। সেটাই বা কে করে? পান্নাদা এখন হাওয়া। হয়তো সেবারের মতো বোম্বে গিয়ে কাটাচ্ছে। নাঃ, কোন উপায় দেখছিনে।

সমু খুব আস্তে বলল, ইনদার মতো গলাটা,কেটে ফ্যাল না ফারু।

চিনু ওর মুখে হাত চাপা দিলে সে হাতটা আলগোছে সরিয়ে দিল। মঘা বলল, ফারু, একটা কথা বলছিলুম। জবাব দাও দিকি বাপ।

বলো মঘাচাচা।

কথাটা হল জান বড়ো, না মান বড়ো?

ফারুক আর চিনু দুজনেই একটু হাসল। ফারুক বলল, কে জানে? কখনও জান, কখনও জানের চেয়ে মানও বড়ো হয়। কেন?

মঘা ভারিগলায় বলল, হুঁ। এটা হল কিনা মরদের কথা—জানের চেয়ে মান বড়ো। আবার একটা জানের বদলে যখন দশটা জান বেঁচে যাবে, তখন সেই জানটার দিকে তাকাতে নেই। অন্তত-পক্ষেতে, মঘা কখনও তাকায়নি। কেষ্টপুরে সিঙ্গিবাড়ি 'খেলতে' গেলুম—সিঙ্গিদের বন্দুকের গুলিতে এক স্যাঙাৎ জখম হল। মাঠের মাঝখানে তার মাথাটা কেটে ফেললুম। সে আমার ডান হাত ছেল। নদীর ধারে পুঁতে দিয়ে এলুম সেটা। বুঝি রে বাবা, বুঝি। কিন্তু···

তিনজোড়া নিষ্পলক চোখ ওর দিকে তাকিয়ে আছে।

কিন্তু তোমাদের কালে দেখেছি উল্টো চলন। এই ছেলেটা··· মঘা সমুর দিকে মোটা খসখসে তর্জনী তুলে নির্দেশ করল—এই ছেলেটাকে তোমরা বাঁচিয়ে রাখলে কেন? শুধু বাঁচিয়ে রাখলে না—তাকে নিয়ে 'লুকোছাপা' করতে যেয়ে ইষ্টিশনে ফের জোর হাঙ্গামা বাধালে। দু'দুটো খুন করলে। এরই জন্যেতে আজ তোমাদের পাট্টিশুদ্ধ বিপদে পড়লে। তোমাদের ওস্তাদকে অব্দি লুকোতে হল। জানো, আজ ওবেলাতে গাঁয়ের মুড়োয় ভিক্ষে করে ফিরছি যখন, থানার ছোটবাবু আমাকে বললে, মঘা—খবরটবর কিছু

দে না বাবা ?···হুঁ, সব শুনলুম। সব জানলুম। পান্নাদাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে ওরা। এই ছেলেটাকে খুঁজছে। মঘা পানির তলার মাছ—ভেবোনা, সে পুলিশটুলিশ ভালই চেনে। তার মুখ কোনদিন কেউ খুলতে পারেনি।··হা হা করে হেসে সে পরমুহূর্তে সতর্ক হল। বলল, যাক্ গে সেকথা। শুধু একটা জবাব তোরা দেদিকি বাপ, একে বাঁচিয়ে রাখছিস কেন ? এর পায়ের ঘা বিষিয়ে গেছে। পা ফুলে ঢোল হয়েছে। ব্যথায় যন্ত্রণায় হারামীটা সারাক্ষণ গেঙাচ্ছে —উঃ, আমার জানটা জ্বলে গেল রে! আমার খুন টগবগ করছে। বুকের ভেতরটা ছটফট করছে। ইচ্ছে হয়, দিই গলাটা টিপে—

ফারুক চিনু একসঙ্গে চাপা গর্জাল।···মঘা!

মঘা বিকৃতমুখে বলল, যে খানিক বাদে মরেই যাবে, তার জন্যে ছেনালি কেন তোদের ফারু ?

মঘা, থামবে ?···ফারুক ঝুঁকে গেল ওর দিকে।

যা, যা! জাঁক দেখাস নে মঘাকে। মঘা বুড়ো হলেও বাঘ— মনে রাখিস কথাটা।···

ওরা অবাক হল। মঘার ভালো চোখটায় জল। কাপড়ের খুঁটে চোখটা মুছছে সে। ফারুক বলল, ছিঃ মঘাচাচা! চেঁচামেচি করোনা তো! কে কোত্থেকে শুনবে।

মঘা ঘড়ঘড় করে বলল, বেশ তো ছিলুম। ভিক্ষেসিক্ষে করছিলুম। চৌধুরীসায়েবের দয়ায় এট্টুকুন মাটিও পেয়েছিলুম দাঁড়াবার। সব ভুলে যাচ্ছিলুম রে, সব ভুলে যেয়েছিলুম। হঠাৎ এ কী উপদ্রব এনে ঘরে ঢোকালি তোরা ? যেমন কিনা ঝড়খানা এসে ঢুকল আর দিলে সব তছনছ করে। আমার খুনে আগুন লেগেছে রে বাপ! আমার মধ্যে শয়তানটা ফের হাই তুলে আড়ামোড়া দিচ্ছে।

হঠাৎ বাইরে পায়ের শব্দ শোনা গেল। চমকে উঠেছিল ওরা। চিনু প্যান্টের ভিতর হাত ভরল। ফারুক বাঁশের দরজার ফাটলে

চোখ রাখল। পরক্ষণে খুলল। বলে উঠল—কে নাজমা? কী ব্যাপার? এখন—

নাজমা ঘুপটি ঘরের দরজায় পা রেখে চিনুকে দেখে একমুহূর্ত ইতস্তত করল। তারপর বলল, বিপ্লবীদের দেখতে এলুম। ঘুম হচ্ছিল না—তাই।

নাজমা ঠোঁটে বিদ্রূপের ভাঁজটুকু কারও দৃষ্টি এড়ায়নি। ফারুক কী বলতে গিয়ে ঠোঁট ফাঁক করল, কিন্তু বলল না। চাপা শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ হচ্ছিল ঘরে।

নাজমা বলল, খিড়কির ঘাটে এসে দাঁড়িয়েছিলুম। ফারুদা, তুমি হয়তো জানো না—কেউ আমায় ঠকাচ্ছে জানলে আমার ভারি অস্বস্তি লাগে। খুব অপমানিত বোধ হয় নিজেকে। সেই জ্বালায় ঘুম আসছিল না। হঠাৎ এখান থেকে তোমাদের কথাবার্তার আওয়াজ পেলুম। আর থাকতে পারলুম না।

ফারুক একটু সরে বলল, বসো।

বসতে আসিনি।

ফারুক মুখ তুলে হাসল।···তবে কি কৈফিয়ৎ নিতে এসেছ? কার কাছে? আমার না সমুর কাছে?

নাজমা হাসল না।···যারা ওয়াগান ব্রেকার, যারা গুণ্ডা, ডাকাত, খুনী—তাদের আমি ভীষণ ঘৃণা করি। বিশেষ করে যখন তারা মুখোস পরে—প্যাট্রিয়টিজমের মুখোস। আনএডুকেটেড বদমাসদের নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই—ভাবনাও নেই। কিন্তু এইসব এডুকেটেডরা যখন···

সমু বিকৃত মুখে হেসে উঠল। তারপর আবৃত্তি করল,

'এদেশে জন্মে শুধু পদাঘাতই পেলাম
অবাক পৃথিবী, সেলাম তোমারে সেলাম।'

নাজমা রুষ্টমুখে বলল, দোহাই আপনার। একজন কবিকে এ ভাবে অপমান করবেন না। ও কবিতা আপনার মুখে মানায় না··· বলে সে দরজা ঠেলে বেরিয়ে গেল।

সমু ডাকল, নাজমা!

বাইরে থেকে আওয়াজ এল, বলুন!

শুধু বলে যান, সত্যিসত্যি আমাকে আপনি ঘৃণা করেন?

কী একটা শব্দ হয়তো উচ্চারিত হল—তা অশান্ত মধ্যরাতের উত্তাল হাওয়ায়, গাছপালার শনশন শব্দে, স্পষ্ট বোঝা গেলনা। সমু চেঁচিয়ে উঠল, কী বললেন? এবং আর সাড়া না পেয়ে সে অসহায় চোখে ফারুকের দিকে তাকাল। · ফারু, কী বলে গেল রে ও? ঘৃণা করে, না করে না?

ফারুক মাথা দোলাল।···শুনতে পেলুম না।

সমু খিকখিক করে হেসে ডাকল, তাহলে মঘা?

মঘা মাথা নুইয়ে নখ খুঁটছিল, জবাব দিল না।

ওরে কানা শয়তান! শুনছিস, তোকে ডাকছি?···জানিস ফারু, আগের জন্মের কথা আমার একটু করে মনে পড়ে যাচ্ছে? তোদের দিব্যি—এখানে আসাঅব্দি সারাক্ষণ—সারাক্ষণ একা হলেই, ঘুম পেলেই স্বপ্নের মতো কথাগুলো আসছে। ছবির মতো ট্রেনের মতো। আমি কত কী জানতে পারছি। আর···সমু বিকট হেসে উঠল।···আর ওই কানা ডাকাতটাকেও দেখতে পাচ্ছি আগের জন্মে। ও কে ছিল জানিস? একটা উল্লুক!

ফারু বলল, চুপ কর্ সমু। কে শুনবে।

চিনু বলল, তুই কিন্তু আমার সঙ্গে কথা বললিনে সমু। আমি তোর কী ক্ষতি করেছি রে? তোর জন্যে আমি এত ছুটোছুটি করছি, এত রাতে দৌড়ে এলুম তোকে দেখতে—আর তুই···যাঃ। সমু, জেনে রাখ, পার্টির আর কেউ তোকে নিয়ে ভাববার নেই—আমি বাদে। ফারুক—ফারুকও না। নেহাৎ তার ঘাড়ে এসে পড়েছিস তাই। তোকে যে এরা বাঁচিয়ে রেখেছে এখনও—সেও আমারই বডি জিম্মা দিয়ে। আমার প্রাণটা বন্ধক রেখেছি, সমু—পান্নাদার হাতে।

ফারুক ক্ষুব্ধ হয়ে বলল, বাজে বকিসনে চিনু।

সমু কয়েক মুহূর্ত চিনুর দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর বলল, আজ কারো ওপর আমার রাগ নেই। চিনু, মরে আমি যাবই। আমি জানি। কিন্তু তার জন্যে দায়ী করে যাব একজনকে। সে আমাকে একদিন বলেছিল, এক কাপ্তেনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব—যাবি সমু? চাইলেই টাকা দ্যায় সে। তখন আমার খুবই টাকার দরকার। চাদ্দিকে অত সব সুন্দর সুন্দর পোষাক খাবার-দাবার স্ফূর্তি। শোকেসে সাজানো কতরকম জিনিস। আর আমাকে শালা হ্যাংলা হয়ে দেখতে হচ্ছে কুতকুতে চোখে। আমার মধ্যে কতরকম সাধ, কত ভালভাল ইচ্ছে,—অথচ কিছুই করা যাচ্ছে না।

চিনু বলল, এ্যাকসিডেন্ট ইজ এ্যাকসিডেন্ট। কী করব বল?

সমু জ্বলন্ত চোখে তাকাল।...তুই বলিস নি সেদিন যে এই র‍্যাকেটে ঢুকলে আর বেরিয়ে আসা যায় না! মরেও নিষ্কৃতি মেলে না। ইনদার লাস থেকে মাথা কাটার ব্যাপারটা শুনেই টের পেলুম আমি কোথায় আছি। তুই আমাকে ঠকিয়েছিলি চিনু।

তোর বোঝা উচিত ছিল অনেক আগেই।

হয়তো ছিল। যাক্‌গে, একটা কাজ করবি? আমি মরে গেলে কাকেও আমার মাথাটা কাটতে দিবিনে? আমার পুরো বডিটা পৌঁছে দিবি মায়ের কাছে?

চিনু মুখ নামিয়ে বলল, দেখব।

দেখব নয়। কথা দে। তুই আমার চিরদিনের বন্ধু। এতটুকু থেকে তোর সাথে আমার চেনাজানা। চিনু!

উঁ?

কথা দে।

দিলুম।

ফারুক বলল, ওঠ চিনু। তোকে পৌঁছে দিতে হবে। তারপর দেখি, কী করা যায়।

চিনু বলল, যাচ্ছি সমু। আমি চেষ্টা করব, যদি তোকে কলকাতা নিয়ে যাওয়া যায়। ভাবিসনে। ফের আসছি। কেমন?

সমু চোখ বুজে রইল। জবাব দিল না।

বাইরে এসে ফারুক বলল, মঘাকে বিশ্বাস নেই। গানটা সমুকে দিয়ে আসা যাক্। দরকার হলে কাজে লাগাবে।

চিনু চমকে উঠেছিল।···তার মানে?

ফারুক নির্দ্বিধায় বলল, মানে আবার কী? ওটা কাছে রাখা ভালো।

সে ঘরে ঢুকল ফের। বলল, সমু, তোর টিপটা রাখ। গুলি পোরা আছে—সাবধান।

সমু তাকাল। হাত বাড়িয়ে নিল পিস্তলটা। বালিশের নিচে রেখে যেন এতক্ষণে আশ্বস্ত হল। ফারুক চলে গেল।

কতক্ষণ পরে।

ঘরে স্তব্ধতা। বাইরে হাওয়ার আলোড়ন। গাছপালার শনশন শব্দ। হঠাৎ মঘা মুখ তুলেছে। ডেকেছে, ছোটবাবু ঘুমোলে?

জবাব না পেয়ে সে বলল, তখন আগের জন্মোর কথা বলছিলে। আমি মোছলমান—তবু কী মনে হয় জানো গো? মনে হয়—আগের জন্মে তোমার সঙ্গেতে কী একটা সম্পক্ক ছেল—রক্তর সম্পক্ক ছেল। তা না হলে কেন···

মঘাডাকাতকে হাউমাউ করে কাঁদতে দেখে সমু অবাক। কিন্তু কিছু বলল না সে। প্রস্তুত হল। যন্ত্রণা সমীপবর্তী হচ্ছে ফের এতক্ষণে। শিসিয়ে উঠছে তীব্র তীক্ষ্ণ একটা কষ্টের ঢেউ। দাঁতে দাঁত চেপে সে অপেক্ষা করতে থাকল সেই অনিবার্যতার।

তখন মঘা কিছু শান্ত হয়ে নাক ঝেড়ে বলছে—আহা হা রে মানবজন্মো!

আট

সকালে অনু তৈরী হচ্ছিল।

কিন্তু খুব ব্যস্ততা ছিল না। আস্তে। অথচ রাতে রেখাকে যখন সকালে বেরোনর এই ইঙ্গিতটা দিয়েছিল, তখনকার কথা ভাবলে, ব্যস্ততা স্বাভাবিক ছিল তার। আরো স্বাভাবিক ছিল যে সে মোটেও চুলে চিরুনী ছোঁয়াবেনা, বাকসো থেকে বিশেষ কোন সাড়ি জামা বের করবেনা, এবং তার চেহারায় থাকবে পুরোপুরি এক বিপন্ন সধবা স্ত্রীলোকের পরিচিতি।

সেটা হল না। কেন হল না, তা তলিয়ে দেখবার ইচ্ছে অন্তত তখনকার মতো অনুর নেই। শুধু বলা যায়, সে টের পাচ্ছিল যে তার মধ্যে কিছু শক্তি এসেছে। আর তাই সে সামান্য সাজগোজ করে নিলে এমন কিছু খারাপ দেখাবে না। সে বাকসো খুলে ফিকে হলদে জমিনে সাদা কিছু নকসাকাটা ভয়েল সাড়িটা বের করল। ফিকে শ্যাওলারঙের ব্লাউজ নিল। চুল আঁচড়ে মোটামুটিধরণের একটি বেণী বাঁধল এবং একটা রবারের আংটায় বেণীর ডগাটা শক্ত করে আঁটল। ছোট্ট ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে সিঁথিতে কিছু সিঁদুরও দিল।

রেখা তৈরী হয়ে এসে বসে আছে। স্থির চোখে অনুর কাজ দেখছে।

ব্রেসিয়ারটা গায়ে চড়াতে অনু সাবধানে পরনের বিস্রস্ত সাড়ির একটা দিক দাঁতে কামড়াল। তারপর রেখার দিকে ঘুরে একটু হাসল।···ফিতেটা এঁটে দাও তো।

রেখা মুখটিপে হেসে বলল, এ্যাদ্দিন কে ফিতে আঁটত বউদি?

যে আঁটবার! বলে রেখা একটু বুক চিতিয়ে আয়নার ভিতর নিজেকে দেখতে থাকল।

রেখা ফিতে আঁটতে গিয়ে বলল, এই মা! বউদি, ফিতে যে ছিঁড়ে! কোথায় আটকাব?

খুঁজে ছাখো—একটা ফুটো আছে।

পাচ্ছিনে!

যাও! তোমার দ্বারা কিস্যু হবে না।

ফুটো নেই। আপনার দিব্যি।

অনু অকারণ ঝাঁঝে বলল, নেই তো এ্যাদ্দিন চলছে কী করে?

শেষ অব্দি মিলল সেটা। তারপর ব্লাউস। বুকের দিকের কাপড়টা নিচে ঝুলে গেল। রেখা যতক্ষণ পিছনে ক্লিপ আঁটছে, অনু ততক্ষণ তার বুকের ঐশ্বর্য দেখে নিচ্ছে। নিরঞ্জনের অনুযোগ —তার বউর বুকটা বড্ড বেশি ইয়ে এবং পরে সন্তানাদি হলে ভাবা যায় না কী বিচ্ছিরি হয়ে পড়বে। এবং অনুর ধারণা, নিরঞ্জনের মধ্যে এখনও স্তন্যপায়ী শিশুর নির্বুদ্ধিতা এবং অভ্যাস কাজ করছে। সে স্ত্রীর খোলা বুকের মধ্যিখানে নাক রেখে ঘুমোতে ভালবাসে। সেই সময় তাকে বলতেও শোনা যায়, অনু, তোমার পেটে কুড়কুড় শব্দ হচ্ছে!

পাগল একটা! অস্ফুট বলে হেসে উঠল অনু। সাড়িটা ফেলে দিল। সব্জে সায়ার ওপর ধোওয়া সাদা একটা সায়ার ঘেরাটোপ তুলে ফেলল। এবং ঘুরে রেখাকে ধমক দিল—এই, উঁকি দিচ্ছ কেন?

রেখা উঁকি দেয়নি। কিন্তু অবাক হচ্ছিল একটু-একটু। অনুবউদির স্বামী হাজতে—আর অনুবউদি দিব্যি হাসিখুসি সাজছে-গুজছে। ফচকেমি করছে। কী মেয়ে রে বাবা!

যতক্ষণ না ভালো সাড়িটা পরা হল, রেখা এইটে ভাবতে থাকল।

সব শেষ করে অনু তার ছোট্ট সাদা ব্যাগটা নিল। তারপর বলল, চল। বেরোই।

রেখা তখনও জানেনা, কোথায় যাচ্ছে ওরা। তার গায়ে গত পূজোয় কেনা টেরিলিনের সুভাঁজ স্কার্ট—ঘন বাদামী রঙ। ব্লাউসটা

সাদা। লম্বা হাতা। গলার কাছে কিছু নকসা আছে। খুবই অকারণে অনু তার পোষাকটায় একবার হাত বুলিয়ে নিল যেতে-যেতে। বলল, বেশ তো জামাটা! জানো রেখা, আমারও মাঝে-মাঝে ফ্রক পরতে ইচ্ছে করে। এই বয়সটা এত ভালো না···

বউদি, তালা দেবে না?

জিভ কেটে অনু ঘুরল। ··এই রে! দেখছ কাণ্ড?

তালাচাবি এঁটে ওরা পিছনঘুরে বুগানভেলিয়ার গাছটার কাছে এল। একটা লাল ফুল ছিঁড়ে নিয়ে অনু দেখল, শক্তিব্রত জানালার ধারে পিঠ রেখে বসে আছেন। সে দু'পা এগিয়ে আস্তে বলল, দাদা, আসছি।

শক্তিব্রত ঘুরে উঁকি মারলেন। ··রিকশো করে নিও। টাকাটাক নেবে। বেশি দিওনা—তবে তাও বড্ড বেশি। মোটে একমাইল পথ বড়জোর।···তা হয়েছে কী জানো? সে আমলে এই নামের যে আসল লোকালিটি ছিল, তা ওখানটাতেই। পরে রেলওয়ে হল। ষ্টেশন হল। তখননা নতুন মৌরীগ্রাম তৈরী হল এখানে। সরকারী কাণ্ডকারখানাই আলাদা। থানাটা সেআমল থেকে ওখানেই রয়ে গেল। মাঝেমাঝে শুনি, এখানটায় হটে আসবে। ওদের সতেরো মাসে বছর! হ্যাঃ হ্যাঃ হ্যাঃ! রেখা, ওকে গীর্জেটা দেখিয়ে আনিস ফেরার পথে। অবশ্যি নিরঞ্জনকে ছেড়ে দিলে আলাদা কথা। বউমা, রেঁধেবেড়ে যাচ্ছ তো?

অনু ছোট্ট করে বলল, হ্যাঁ।

দেখো—ওসি লোকহিসেবে ভালই। ওঁকে বুঝিয়ে বলো। উদোর পিণ্ডি সবসময় তো বুধোর ঘাড়ে গিয়ে পড়ে। এও তাই হয়েছে! পরে আমিও দেখব'খন। এস, বেলা বাড়িও না।

চলে এল দুটিতে। আসতে আসতে রেখা বলল, তুমি বাবাকে দাদা বলো?

হুঁ।

এই মা! আমি যে তোমাকে···

অনুকে ষ্টেশনে ঢুকতে দেখে রেখা কথা থামিয়ে চেঁচিয়ে উঠল—আরে ওদিকে কোথা? থানা তো পশ্চিমে। উল্টোদিকে যাচ্ছ কেন?

অনু রেখার হাতটা ধরে টানল।···বকো না। চুপচাপ এস সঙ্গে।

রিকসো নেবেনা?

ওদিকে গিয়ে নেব'খন।

রেখা অবাক।

ওরা ওভারব্রীজে উঠল না। প্লাটফরমে গিয়ে ডাইনে চলতে থাকল। তারপর লাইনের ধারেধারে হাঁটল। সামান্য যাওয়ার পর লাইন পেরিয়ে একটা ফটকে পৌছল। একচিলতে পীচের পথ পুব থেকে পশ্চিমে এসে লাইন পেরিয়ে ষ্টেশনের কাছে বাজারে পৌঁছেছে। ফটকটা খোলা ছিল। একটা খালি রিকশো আস্তে আস্তে আসছিল ওদিক থেকে। হয়তো যাত্রী রেখে ফিরল কোন দূরের গ্রাম থেকে। অনু ডাকল, এই রিকশো, যাবে?

যাব।

দেবীবাবুর ফার্ম অব্দি কত নেবে?

বারো আনা।

রেখা, এস।

ফের রেখা অবাক।

সারাপথ আর কোন কথা নেই। রাস্তা কিছুদূর গিয়ে বাঁয়ে উত্তরে ঘুরেছে। ফলকে লেখা আছে: পায়রাডাঙা চার কিলোমিটার। মৌরীগ্রাম এক কিলোমিটার। দুদিকে দুটো তীরচিহ্ন। বাঁয়ে ঘুরে ফাঁকা মাঠ দুদিকে। কিছুদূরে সামনে বাঁদিকে টানা সবুজ বন—ডাইনে নদী। রাস্তার দুধারে ঘন ঝোপঝাড় আর তরুণ গাছপালার সার। জঙ্গলের কাছে এসে রাস্তা ঘুরেছে ফের পূর্বে। ছোট্ট ব্রীজ নদীর ওপর। তারপর ফের বাঁক এবং উত্তরগামী হয়েছে। বাঁকের মুখে ফার্মের বাংলোপ্যাটার্ন সুদৃশ্য বাড়ীটা দেখা যাচ্ছিল। ফুলের রঙ ঝকমক করছিল চৈত্রের রোদে। পাশে

খামার। চৈতালী ফসল মাড়াই হচ্ছে। গাছের তলায় আখমাড়াই কলটা ঘুরছে। গুড় জ্বাল দেওয়া হচ্ছে প্রকাণ্ড কড়াইয়ে। মিঠে ঝাঁঝালো গন্ধ ভেসে আসছিল। চারপাশে বসতীবিহীন নির্জন মাঠগুলো। সবুজ ক্ষেতের কাছে পাম্পিং মেসিন। ধকধক শব্দ হচ্ছিল। একটা পরিচ্ছন্ন নিটোল সুখের ব্যাপ্তি এখানটায়।

নীচু পাঁচিল ঘেরা বাড়িটা। শুধু ফুল আর ফুল। পিছনে আটচালায় অনেকগুলো গরু। তারের জালঢাকা খাঁচার মতো—সেখানে হাঁসমুরগী রয়েছে। ছোট্ট পুকুরের পাড়ে কলাবাগান। কোথাও কোন লোক নেই এখানে। অন্তত এত তাড়াতাড়ি তো দেখাই গেল না।

উঁচু বারান্দায় একটা মস্তো কুকুর বসে রয়েছে। তার গলায় চেন। চাপা গরগর আওয়াজ শোনা গেল তার। গেটের পাশে রিকশো থেকে নামল ওরা।

অনু বলল, রিকশোওলা, তুমি যদি খানিকক্ষণ অপেক্ষা করো—তোমার রিকশোতেই ফিরব। সবশুদ্ধ কত নেবে?

রিকশোওলা বলল, যা হয় দেবেন। দরাদরি করব কার সঙ্গে? আপনারা চেনা মানুষ।

রেখার মুখটা থমে। অনু হাসল।···চেনো নাকি?

হুঁউ। ওই খুকিদিদি তো বড়বাবুর মেয়ে—আপনি···আজ্ঞে আপনাকেও চিনি। যান, যান। রইলুম। কী কাজে যাচ্ছেন, সেও কি বুঝিনা দিদি? এই বাবু ইচ্ছে কল্লে সবই পারেন—মস্তো লোক।

চমকে উঠল অনু। ভীষণ খারাপ লাগল। বিরক্তি এল। রিকশোটা ছেড়ে দেবে নাকি? কিন্তু ছাড়ল না শেষঅব্দি। গেটের কাছে দাঁড়িয়ে সে ইতস্তত করছিল। কুকুরটাকে বড্ড ভয় করছে তার। কোন লোকও যে দেখা যাচ্ছে না ছাই!

এবার রিকশোওলা আরও উৎসাহী হয়ে উঠল। সে রিকশো থেকে নেমে দৌড়ে গেটের কাছে এল। বলল, দাঁড়ান—ডেকে দিচ্ছি।

সে বিকট গলায় চেঁচাতে লাগল, মুকুন্দদা, মুকুন্দদা হে। অ মালীদাদা।

ফুলঝোপের ভিতর একটা মুণ্ডু ভেসে উঠল। · কে রে?

এই ছাখো, এনারা এয়েছেন। টেশনের মাষ্টারবাবুদের বাড়ির লোক। বাবুর সঙ্গে দেখা করবেন। জরুরী দরকার।

অনু জ্বলে যাচ্ছিল রাগে। কী আপদটা জুড়ে বসল কোত্থেকে! রাজ্য জুড়ে রটাবে নির্ঘাৎ। ছি, ছি, কী কেলেঙ্কারীর কথা।

মুকুন্দ মালী সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনুরা পূর্বে—অতএব সে কপালে হাত রেখে সূর্য আড়াল করে কয়েকমুহূর্ত ওদের দেখে নিল। তারপর ধীরেসুস্থে হেঁটে কাছে এল। বলল, বাবু তো নেই। আজ সক্কালের গাড়িতে কলকাতা গেছেন। ফিরতে রাত্তির হতেও পারে —আবার কাল সকাল হতেও পারে। কোত্থেকে আসছেন আপনারা? কী কাজ, বলুন—বাবু এলে বলব।

অনু রেগেই ছিল। বলল, অত খোঁজে দরকার কী তোমার?

মুকুন্দ ফ্যাচ করে হাসল।···আজ্ঞে, বাবুর হুকুম এটা। দশের কাজে থাকেন তো—সর্বক্ষণ লোক আসে নানান জায়গা থেকে। কৈফৎ আমাকে দিতে হয় দিদি। কে এসেছিল, কেন এসেছিল-- হেঁঃ হেঁঃ হেঁঃ। আসুন আসুন। বসবেন নাকি? বাবু রাগ করবেন —যদি না বসতে বলি। একটু বসেই যান বরং। বাবুর মেয়ে আছেন। কিছু বলতে হলে ওনাকেও বলে যেতে পারেন।

অনু ঘুরতে গিয়ে ঘুরল না। রেখার দিকে তাকাল।···এই! সুখেতা আছে। দেখা করে যাই বরং। কী বল রেখা?

রেখা লাফিয়ে উঠল এতক্ষণে। ···চল বউদি।

মুকুন্দ সামনে হাঁটছিল। কখনও পিছু ফিরে হাতদুটো চিতিয়ে পথ দেখানোর ঢঙ করছিল। এবার অনুর হাসি পেল। জননায়ক হবার বুঝি এই জ্বালা! মালীটাকে কেমন ট্রেনিং দিয়ে রেখেছেন ভদ্রলোক। কেউ চটে যাওয়া মানেই তো একটি ব্যালটপেপার হাতছাড়া হওয়া।

তার ধারণাটা দৃঢ় হল যে দেবীবাবুর সাহায্য মিলবেই। উনি নিরঞ্জনের জন্যে তদ্বির করলে আর ভাবনা নেই। আজকাল তো এঁদেরই বড্ড সমীহ করে চলে সরকারী লোকেরা। রেলের লোকেরাও এঁদের বড্ড মান্য করে। অনু জানে।

তারপর সুশ্বেতা—সুশ্বেতার মতো মেয়ে যখন আছে!

সুশ্বেতা বেরিয়ে এল। একমুহূর্ত নিষ্পলক তাকাল ওদের দিকে। কেমন যেন নীরস দৃষ্টি—উস্কোখুস্কো চেহারা সুশ্বেতার। থমথমে মুখ। ঠোঁটের কোণে একটা সূক্ষ্ম কুঞ্চন।

অনু হেসে বলল, যেচে পড়ে এলুম। আসতে তো বলেন নি!

সুশ্বেতা—আশ্চর্য—হাসলনা। ভারি গলায় বলল, কী ব্যাপার?

দমে গেল অনু। নার্ভাস মুখে বলল, আপনার বাবার সঙ্গে একটু দরকার ছিল, তাই।

সুশ্বেতা দৃষ্টিটা দিগন্তে চালিয়ে বলল, বাবা নেই। তাছাড়া, বাবার সঙ্গে কী দরকার—তা তো বুঝতেই পারছি। কিন্তু আপনি ভাবলেন কেন যে বাবার মত লোক বদমাইস গুণ্ডা ওয়াগন ব্রেকারদের জন্য মাথা ঘামাবেন?

ছিঃ ছিঃ! কী বলছেন আপনি?···অনু অস্ফুট ককিয়ে উঠল।

হ্যাঁ। আপনার সাহসও অসাধারণ। এই নিয়ে আবার তদ্বির করে বেড়াচ্ছেন! লজ্জা করা উচিত ছিল আপনার।···সুশ্বেতা নিষ্ঠুর মুখে বলল।···কখনো এ আশা করবেন না যে দেবী ব্যানারজি বা তার মেয়ে ডাকাতগুণ্ডার বাড়ির লোকদের খুব বেশি খাতির করবে!

অনু বিকৃত মুখে বলল, ডাকাতগুণ্ডার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে দেবী ব্যানারজির মেয়ের তো দেখছিলুম, ভীষণ ব্যস্ততা! আচ্ছা—চলি। আয় রেখা।

অনু পিছন ফিরেছিল। সুশ্বেতা বলে উঠল, মোটেও না। কেউ যদি বিপ্লবী বা নকসাল সেজে ভাঁওতা দ্যায়, আমি কী করতে পারি? তখন অব্দি জানতুম না যে কী হয়েছে!

অনু মুখ ফিরিয়ে সব্যঙ্গ বলল, আপনি তাহলে নকসালসাপোর্টার, নাকি নকসাল ?

পারেন তো ধরিয়ে দিন। বলে সুশ্বেতা ঘরে ঢুকে গেল।

মুকুন্দ আড়ালে খিকখিক করে হাসছিল। মেয়েলি ঝগড়ার রকমসকমটা বেশ সুস্বাদু। চাটনি যেমন। হেঁঃ হেঁঃ হেঁঃ।

মুরগীর খাঁচার দিক থেকে আওয়াজ এল—হাসছ কেন মুকুনদা ?

মুকুন্দ মুহূর্তে গম্ভীর হয়ে জবাব দিল—না, হাসিনি। হাসব কেন ? ওটা একটা ইয়ে।...এই হারু! বাছুরটা ধর, ধর। দিলে চারাগুলো মুড়িয়ে।

রিকশোটা খুব কষ্টে চলেছে। সামনে দক্ষিণের বাতাস। রিকশোওলা কুঁজো হয়ে প্যাডেল ঠেলছে। ব্রীজের মুখে গিয়ে আর পারল না। নেমে টানতে লাগল হ্যাণ্ডেল ধরে। বেশ উঁচু কিনা। হাতির পিঠ একেবারে। তার ওপর রোদ্দুর চড়া হচ্ছে। অনু ক্ষেপে গিয়ে বলল, হুডটা তুলবে নাকি ?

কোয়াটারের কাছে শিরিষতলায় শক্তিব্রত দাঁড়িয়ে ছিলেন। দৌড়ে এলেন।...আরে কী বিপদ! তোমরা কোন পথ দিয়ে এলে ? এত দেরীই বা কেন ? তখন থেকে কেবল ঘরবার করছি।

দুজনেরই মুখটা গুমোট। রেখা কী বলতে যাচ্ছিল, অনু সাবধানে ওর হাতে হাত ছুঁইয়ে চোখ টিপল।

বুঝলে বউমা ?...শক্তিব্রত মহানন্দে ওদের আগে আগে যাচ্ছেন। তোমার যাওয়া দেখেই বুঝেছিলুম, কাজ হবে। হাজার হলেও ভদ্রঘরের বউঝি—তার সম্মানের দক্ষিণা বলে একটা কথা! এ্যাঁ ? যাক্ গে। ভালয় ভালয় ফিরয়ে এনেছ। এবার একটু বুঝিয়ে শুঝিয়ে বোলো—

অনু থমকাল।...কার কথা বলছেন ?

আবার কার? নিরঞ্জনের।

অনু রুদ্ধশ্বাসে বলল, ও ফিরেছে?

হ্যাঁ। কতক্ষণ।...শক্তিব্রত চাপা হাসলেন।...আমার ওপর বড্ড রেগে আছে। ভেবেছে বুঝি আমারই সব কীর্তি।, কথাই বলল না একেবারে। তা না বলুক। পরে ম্যানেজ করে নেব'খন। মনো হারামজাদা ভালমানুষ সেজে নাম কিনলে—মাঝখান থেকে নিরু ভাবলে, আমিই নাটের গুরু। তা হ্যাঁ বউমা, টাকা পয়সা কিছু চাচ্ছিল-টাচ্ছিল নাকি?

অনু বিভ্রান্তভাবে বলল, না।

যাও—ওকে গিয়ে সেবাযত্ন করো ভালমতো। চানফান করেনি—তার ওপর দুশ্চিন্তা—চেহারা একেবারে ভেঙে গেছে বেচারার। আয় রেখা, তুই পরে যাবি'খন।

রেখাকে নিয়ে শক্তিব্রত চলে গেলেন। অনু পলকে পলকে অনুভব করছিল, তার ভিতরটা চরম একটা পুলকে ফেটে পড়ছে। শরীর হয়ে উঠেছে হাল্কা। সারা পৃথিবী এখন যেন তার হাতের মুঠোয় এসে গেছে। আনন্দে সুখে আবেগে তার বুকটা ফুলে-ফুলে উঠতে থাকল। সাহস তার রক্তে খেলা করতে লাগল। সুশ্বেতার মুখটা তার চোখে ভেসে উঠল। তার ইচ্ছে হল, এখন সুশ্বেতা সামনে থাকলে তার গালে চড় মারতে পিছপা হতনা সে। তার স্বামী ডাকাতগুণ্ডা ওয়াগনব্রেকারদের দালালী করে—বেশ করে! একশোবার করবে। করবেনা কেন শুনি? আমার যা ন্যায্য দরকার, তা তোমার যোগাবার মুরোদ নেই—আবার আমি যদি যেকোন ভাবে হোক, সে দরকার মিটিয়ে নিই—তুমি পুলিশ পাঠাবে। বাঃ রে বাঃ! আর তাই কি হচ্ছে না সংসারে? কোন মানুষটা সাধুতপস্বীর মতো কাজ করছে বল তো? বুকে হাত দিয়ে বলুক না ওরা—জীবনে কাকেও ঠকায় না, কারো আত্মসাৎ করে না—সব একেকটি আস্ত মহাপুরুষ! যাও, যাও—খুব জানা গেছে।...অনুর ওইটুকু পথ হাঁটতে যেন বছর লেগে যাচ্ছিল। নিরঞ্জনের চেহারাটা

তার ব্যাকুলতার ঢেউয়ে-ঢেউয়ে দুলছিল ভাঙা নৌকোর মতো। না জানি, কত রোগা হয়ে গেছে এরই মধ্যে! ওরা হয়তো ক্ষিদের সময় খেতে ছায়নি। তেষ্টার সময় জল ছায়নি। ওর মাথার জখমটার চিকিৎসাও করেনি বুঝি। আনন্দের পর গভীরতর দুঃখ অনুকে গ্রাস করল।

চোখে কান্না আর মুখে হাসি নিয়ে সে হাঁফাতে হাঁফাতে দরজা ঠেলল। দরজা খোলা ছিল। ভিতরে ঢুকে সে এক লাফে পৌঁছে গেল ঘরের মধ্যিখানে। বলল, কখন এলে?

বুকে ঝাঁপিয়ে পড়বে ভেবেছিল অনু। ভেবেছিল দুহাতে জড়িয়ে ধরে বারবার চুমু খাবে। কিন্তু নিরঞ্জন—

নিরঞ্জন ভ্রূ কুঁচকে লাল চোখে গর্জে উঠেছে, কোথায় গিয়েছিলে?

থমকে দাঁড়াল অনু। হাসবার চেষ্টা করে বলল, আবার কোথায়? তোমার জন্যে দেবীবাবুকে বলব ভেবে গেলুম—তা···

নিরঞ্জন উঠে দাঁড়াল।···দেবীবাবুর কাছে? কেন আমাকে না জানিয়ে তুমি ওই শুওরের বাচ্চার কাছে গিয়েছিলে? এ্যাঁ?

অনুর মুখে কথা সরছিল না।

এই মাত্র একটা দিন আগে বুদ্ধির দোষে আমার হাতে পিটুনি খেলে—ফের তুমি নিজের বুদ্ধিতে কাজ করতে গেছ? ধিক তোমাকে! তোমার মাথায় কি গু পোরা আছে?

অনু কী বলবে ভেবে পাচ্ছিল না। কেন নিরঞ্জন এমন হয়ে গেল হঠাৎ? সেদিন না হয়, অসাবধানতার দোষ ছিল। কিন্তু আজ? সে স্থির দাঁড়িয়ে ঘামছিল। একটা বিপুল আনন্দের প্রত্যাশা হঠাৎ এমনি করে চুরমার হয়ে গেল! সে কেঁদে ফেলল। দুহাতে মুখ ঢেকে দেওয়ালের দিকে ঘুরে দাঁড়াল।

নিরঞ্জন ক্ষুব্ধমুখে বলল, তোমার হঠকারিতায় আমার যা সর্বনাশ হবার হয়ে গেছে। সাসপেণ্ড তো হচ্ছিই তারওপর কেসে লম্বা জেল হবে। তখন তুমি কচুপোড়া চুষো। দেখব'খন। অবশ্য তার

আগেই হয়তো পান্না আমায় ষ্ট্যাব করবে। আমার আর বাঁচোয়া নেই। থান কিনে এনে রাখো, বলে দিলুম। ঔঃ!

অনু সামলে নিয়ে ঘুরে বলল, পান্নাবাবু আড়াইশো টাকা পাঠিয়েছেন গতরাত্রে। খরচ করিনি। এই নাও। আমি চলে যাচ্ছি।

চলে যাওয়ার কথায় আমল দিল না নিরঞ্জন। সে ব্যস্ত হয়ে বলল, পান্না টাকা পাঠিয়েছে! কই?

খামশুদ্ধ টাকা নিয়ে সে প্রথমে ক্ষিপ্রভাবে গুনল এবং তারপর চিঠিটা দ্রুত পড়ে ফেলল। বলল, তখনও জানত না যে আমি ওর নাম করেছি!···একটু হাসলও সে।

অনু চমকে উঠে বলল, ওর নাম করেছ তুমি?

নিরঞ্জন জবাব দিল না।

অনু কিছুক্ষণ ওর দিকে তাকিয়ে থাকার পর ভিজে গলায় বলল, এত যখন আমি তোমার বিপদের কারণ হচ্ছি, তখন আমার এখানে থাকা, আর ঠিক নয়। আমি যাচ্ছি।

নিরঞ্জন তাকাল।···যাচ্ছি মানে?

অনু পা বাড়িয়ে আলনা থেকে একটা সাড়ি নামাতেই নিরঞ্জন তার হাতটা ধরে ফেলল।···আঃ, কী হচ্ছে অনু!

অনু হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে দ্বিগুণ উদ্যমে কাপড়চোপড় তুলতে থাকল।···লেখাপড়া তো বেশ খানিকটা জানিই। একটা পেটের জন্যে অসুবিধে হবে না। বরং কারো বাড়ি ঝিগিরি করব।

নিরঞ্জন দুহাতে ওকে জড়িয়ে ধরে টেনে আনল।···মাথা খারাপ করোনা। তুমি একা যাবে কী, আমাকেও তো যেতে হবে। শিগগির গা ঢাকা দিতে হবে কোথাও। পুলিশ কি সারাক্ষণ আমার পাহারা দিয়ে থাকবে? শালা পান্নাকে আমি চিনি। ওর হাত থেকে আমার নিস্তার নেই। আঃ অনু, কী হচ্ছে। আঃ ছি ছি! কী ছোটলোক মেয়ে!

অনু ধস্তাধস্তি করছিল। তার ফোঁপানি বেড়ে যাচ্ছিল ক্রমাগত।

নিরঞ্জন অধৈর্য হয়ে ধাক্কা দিয়ে বসল এবার। অনু আছাড় খেল মেঝেয়। কেঁদে উঠল সশব্দে।···যত দোষ আমার? আমি তোমাকে বলেছিলুম পান্নাদার দলে ঢোক? টাকাগুলো তুমি আমার সংসারে খরচ করতে? কখানা সাড়ি গয়না দিয়েছ? কতটাকা আমার নামে ব্যাঙ্কে রেখেছ? সবই তো তোমার বাবাভাইদের সংসারের গর্তে ফেলে দিয়েছ। ইস্, এখন সাধু সাজা হচ্ছে। বদমাইস গুণ্ডাডাকাতদের সঙ্গে সঙ্গ যার, সে কোনদিন মানুষ হতে পারে? এখন ছেলের কীর্তি শুনে তোমার বাবা-মা বলবেন—ওর কুচুটে বউটাই যত সর্বনাশের মূলে। সখ করে বিয়ে করেছিল। সখের বউর বিলাসব্যসন যোগাতেই ছেলে আমার পাপ করতে লেগেছে। হুঁ-উ। আমি বুঝছিনে? চোরে করবে চুরি, দায় চাপবে আমার কাঁধে!

নিরঞ্জন আর সহ্য করতে পারলনা। অনুর পিঠে যথাশক্তি লাথি মেরে বসল।···ছেনাল, খানকি, বেশ্যা কোথাকার। কাঁধে চেপে আমার ফ্যামেলিকে পর করে ফেললে। আবার উল্টে মুখ খিস্তি করা হচ্ছে আমি চোর? যেদিন থেকে এ পাপ আমার ঘরে ঢুকেছে, সেদিন থেকেই আমার কুলোচ্ছে না। অলক্ষ্মী, অপয়ে, হতচ্ছাড়ী, বাঁজা মাগী। একটা বাচ্চা বিয়োবার মুরোদ নেই! আমার লাইফটা হেল করে তুললে। আবার···

শক্তিব্রত আসছিলেন খুসিমনে। উঠোনে পৌঁছেই থমকে দাঁড়ালেন। তারপর কানে আঙুল দিয়ে ফিরে গেলেন।

বাইরে গিয়ে অকারণ গলা চড়িয়ে ডাকছিলেন শক্তিব্রত।··· রেখা, ও রেখা।

বিকেলে প্লাটফরমে বিষন্নমুখে বসে আছেন শক্তিব্রত। ভাবছিলেন, আসলে মানুষের স্বভাবটাই এরকম। দিব্যি খাসা মুখোস

পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে—খাচ্ছেদাচ্ছে—স্ফূর্তি করছে। কিচ্ছু টের পাবার উপায় নেই। এদিকে ভিতরে-ভিতরে পচে বজবজ করছে। দুর্গন্ধে বমি আসে। ছ্যাঃ!

তবে নিরঞ্জন আর তার বউর ব্যাপারটা একটু ভিন্ন। অন্তত রেখার রিপোর্ট যদি ঠিক হয়।

ওদের স্বামীস্ত্রীর মধ্যে একটা চোরা ফাটল ছিল। এই দুর্ঘটনায় সেই ফাটল হঠাৎ আত্মপ্রকাশ করে ফেলেছে। এখন দুজনে দুদিকে সরে গেল। মানুষের জীবনের এই একটা জটিল সমস্যা যে নিজের নিজের দিক থেকে প্রত্যেকে ঠিকপথেই রয়েছে—কিন্তু অন্যের দিক থেকে তার পথটা ভুল। সহযোগিতাই নাকি সভ্যতার বড় উপাদান অথচ অসহযোগিতাও সমানে কাজ করে যাচ্ছে। প্রতিটি মানুষের মধ্যে একটা স্ব-বিরোধ রয়েছে। যে মানুষ সহযোগী, সেই মানুষই অসহযোগী।···আরে মনো যে! এস, এস। নিরঞ্জনকে জামিন দিয়েছে শুনেছ? এদিকে···খিকখিক হেসে ফেললেন শক্তিব্রত—এদিকে ওর বউ রেগেমেগে বাপের বাড়ি পালিয়েছে। পালাবে না? অসচ্চরিত্র গুণ্ডামার্কা স্বামীর ঘরে অমন মেয়ে কি তিষ্ঠোতে পারে হে?

মনমোহন টি সি অন্যমনস্ক হয়ে বলল, নিরঞ্জন এসেছে নাকি? কখন?

সকাল দশটা-টশটা হবে। বসো।

বসব না। সিগনাল দিচ্ছে না কেন?···ঘড়ি দেখে মনমোহন বলল, পাঁচটা সাত হয়ে গেল। তা আপনি জয়েন করছেন কবে শক্তিদা?

রোস। কদিন জিরিয়ে নিই। মারধোর খেয়েছিলুম বলেই না দিনকতক দিব্যি গ্যাঁজানো গেল।···শক্তিব্রত হাসলেন।···আঃ, ভাই মনো। দায়ঝক্কিছাড়া জীবনের স্বাদটা বেশ পাচ্ছি হে। লাইন ক্লিয়ার নেই, টরেটক্কা নেই, সিগনাল নেই—শালা বেদম স্ফূর্তি।

মনমোহন ঘনঘন নিচে অদূরে কোয়াটারের দিকে তাকাচ্ছিল। এবার বলল, বসি খানিক। ডাউনটা আবার লেট করল মনে হচ্ছে। নিন দাদা, চারমিনার।

হাত নাড়লেন শক্তিব্রত।···ফের খৈনী ধরব ভাবছি। আরে অ রামশরণ, ওরে ব্যাটা! এদিকে আয়দিকি! মুখটা পচে যাচ্ছে, বাবা। শিগগির আয়।

মনমোহন বসে পড়েছে, তার কারণ—নিরঞ্জন। নিরঞ্জন এদিকে তাকালেই মনমোহনকে দেখতে পেত। বুকটা একটু একটু কাঁপছিল মনমোহনের। বিশ্বাস নেই, পান্নার গ্যাঙে যখন ভিড়েছে—ছুরি পিস্তলও রাখে বইকি কাছে! কিন্তু পুলিশের কী আক্কেল!

একটু পরে সে কৌশলে কোয়াটারের দিকটা ফের দেখে নিল। নিরঞ্জনকে আর দেখতে পেল না।

রামশরণ এসে বলল, গাড়ি লেট হোল স্যার। কাটোয়া জংশিনমে আভি নেহী পঁহুছা।

বল কী? লাফিয়ে উঠল মনমোহন।···কী মুশকিল! মালগাড়ি-ফাড়িরও তো খবর নেই।

শক্তিব্রত বললেন, আরে, ছেড়ে দাও। একা মানুষ—বউ তো নেই। চলো, কোয়াটারে গিয়ে বরং তাসফাস খেলা যাক্। রেখা আমি তুমি—ব্রে খেলব। ওঠ।

মনমোহন বলল, না শক্তিদা। আজ বরং···

আরে ছাড়ো! চল না।···চোখ নাচালেন শক্তিব্রত।···রেখু আজ যা ডিমের কালিয়া রাঁধবে না—জীবনে খাওনি! তুভায়ে আজ খেয়েটেয়ে গলা ধরে শোব।

হিড়হিড় করে টানতে টানতে নিয়ে চললেন শক্তিব্রত। বলির পাঁঠার মতো যাচ্ছিল মনমোহন। তার কালো কোটটা প্রায় খসে যাবার দশা হচ্ছিল গা থেকে। শক্তিব্রত মানুষটাই এরকম বিদঘুটে!

ঘরে ঢুকতেই রেখা জানাল—নিরঞ্জনদা তার ঘরের চাবি দিয়ে গেছে। বলে গেছে, কবে ফিরবে ঠিক নেই। যদি ইতিমধ্যে ওর ভাই-টাই কেউ আসে, চাবিটা যেন তাকে দেওয়া হয়।

মনমোহন সোল্লাসে বলল, ব্যাটা আণ্ডার গ্রাউণ্ডে চলে গেছে!

রেখা কিছু না বুঝি বলল, বউদিকে আনতে যাচ্ছে বলল।

শক্তিব্রত বললেন, মরুক গে। ইয়ে—রেখা, তাসের প্যাকেটটা দে। একটুখানি চা কর। তারপর ঝটপট রান্নাটা সেরে নে। ডিম খাব আজ। বুঝলি? মনোও খাবে।

রেখার মুখটা গম্ভীর দেখাল।...ডিম নেই যে আর।

শক্তিব্রত বললেন, কিনে আন না। বরং কাকেও ডাক্। কিনে আসুক।

মনমোহন পকেট থেকে চকোলেটের একটা টিন বের করছিল। ...আরে কী কাণ্ড! একেবারে ভুলে গিয়েছিলুম দেখছি। এই যে রেখা—নাও। মৌরীগ্রামে খালি হাতে আসতে ভয় করে।...হেঁ হেঁ হেঁ!

রেখার মুখটা মুহূর্তে উজ্জ্বল।

নয়

চাপা গোঙানির শব্দে ঘুম ভেঙে গেল মঘার। সে ধুড়মুড় করে উঠে বসল। আলোর দম বাড়িয়ে দিল। তারপর আলোটা তুলে সমুর মুখটা দেখে নিল সে। সমুর ঠোঁটটা ফাঁক হয়ে আছে—একটু একটু কাঁপছে। মঘার বুকে হাতুড়ি পড়তে থাকল। আই বাপ! ছেলেটা মরে যাচ্ছে না তো? আজ সারাদিন মঘা ঘর ছেড়ে নড়েনি। নড়তে ইচ্ছে করেনি। চুপচাপ বসে থেকেছে পায়ের কাছে। সমুকে জল খাইয়েছে। জ্বরের ঘোরে অনর্গল ভুল বকেছে সে। যন্ত্রণায় চাপা গেঙিয়েছে। মঘা তাকে ডেকেছে। আশ্বস্ত করতে চেয়েছে। আর ওনাদের কী আক্কেল! আজ কেউ—কেউই আসেনি সমুর কাছে। মঘা ভেবেছিল, নাজমাকে ডাকবে। নাজমা নাকি বাড়ি নেই। কোথায় বেরিয়েছে। চৌধুরী-সায়েবকে ব্যাপারটা বলতে গিয়েছিল—তিনিও ধমক দিয়ে বলেছেন, তোর কী বাবা? তুই চুপচাপ কোথাও বসে থাকগে না। মরবে তো মরবে—তখন পুঁতে ফেলার ব্যবস্থা করব লাসটা।···মঘা বলেছিল, তাহলে বরং পুলিশকে খবর ছান মিয়াসাব। এ আপদ ঘাড় থেকে বিদেয় হোক। আমার যে ইদিকে বড্ড জ্বালা গো!··· চৌধুরী আরও ধমক দিয়েছিলেন—তুই ব্যাটার যেমন আক্কেল! পুলিশ তখন আমাকেও ফাঁদে ফেলুক। যা, বরং কদিন কোথাও ভিক্ষের ছলে ঘুরে আয়।···মঘা যায়নি। যেতে পারেনি। যাওয়া কি সহজ কথা?···মঘা মনেমনে বলেছে।···আমার জ্বালাটা তো বোঝাতে পারবনা বাবারা। নিজের তো একটাও নেই—মঘা মলেই মঘার সব ফুরুল—তাই নাকি বড্ড মমতা হল গে ছোঁড়াটার ওপর। আহা হা, মানবজন্মোর কথা যে ভাবলেনা, সে কি মানুষ? মানুষ লয়। দেখে এসোদিকি ছেলের সরল লিতুষী মুখখান—তোমার

বাপের রক্তে ঝড় বয়ে যাবে। বাপ তুমি হতে পারোনি—কিন্তু বাপ তোমার মধ্যিতে একজন আছে। একজন থাকেই। কারণ কিনা তুমি পুরুষ। তুমি এয়েছ সংসারে—তার পিকিত কাজটা কিনা জম্মো দেওয়া। জম্মো দিতে তুমি পাল্লেনা। তাই বিধেতাপুরুষ তোমার দুঃখেতে দুঃখু পেয়ে—অই, অই ছ্যাখো, পাঠালে একখানা মাণিক। ওরে হারামজাদা মঘা, তোর জেবনটা সাথক হল রে, সাথক হল!

মনেমনে এইসব বলেছে মঘা আর আফশোস করেছে। কপালে করাঘাত করেছে আর বলেছে, হায় রে মানবজম্মো! রান্না করতে ইচ্ছে করেনি। আগের দিনের ভিক্ষের কিছু চাল ছিল। কাঁচা চিবিয়ে খেতে গিয়ে থু-থু করে ফেলে দিয়েছে। দুপুরে একবার ক্ষিদে পেয়েছিল। ভেবেছিল, চৌধুরীবাড়ি গিয়ে অভ্যাসমতো চেয়ে খাবে। চৌধুরীর কথায় তার রাগঘেন্না হওয়ায় সেটা আর সম্ভব হয়নি।

ক্ষিদের পেটে ঘুম পাবার কথা নয়। তবু ঘুম এসে গিয়েছিল কেমন করে। যাকে বলে চট্‌কা ঘুম—হঠাৎ ভেঙে গেছে। শরীরটা দুর্বল লাগছে। সে আলোটা রেখে দিল। দুঃখে অভিভূত হয়ে বসে রইল।

সমুর মাঝেমাঝে গোঙানি থেমে প্রলাপ শোনা যাচ্ছিল। মঘা কান খাড়া করল। কিন্তু একটি কথাও বুঝতে পারল না।

…পল্টুদাটা যাসব গুল মারে না! মাথা গুলিয়ে ছ্যায়, মাইরি। হ্যাঁ—এখান থেকে ওখানটায়—ওই, ওই যে পাজামা পাঞ্জাবী পরা শুওরের বাচ্চা,…ঠিক পাছায় ঝাড়বি, হুঁউ, চিনু করল কী রে!… পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে গলায় একেবারে…হিঃ হিঃ হিঃ, ভাবা যায় না! পোষ্টার লাগাচ্ছিল। পোষ্টার দিয়ে মুছে ফ্যাল না শিগগির!… পুলিশ! চালা গুলতি, হু র্‌ র্‌ র্‌ র্‌ র্‌…সাবাড়। আটগাঁ আর বিজয়গড়ের মাঝামাঝি পিন করবি—সাতটার লোকাল।…বিয়ের লোকেরা আছে।…আমি ভুল করছি? উরে শালা! ফের গুল? পল্ট দাকেই ঝেড়ে এলুম…হিক্‌ হিক্‌ হিক্‌! কোন দলের নামে

ওরা চালিয়ে দেবে। দিক্। আমি বাবা আর দলবাজীতে নেই। মুক্তাঞ্চল যেমন—তেমনি আমি মুক্তমানুষ—ফ্রি ম্যান।···মার্চ··· লেফট-রাইট···লেফট···ধুস শালা! উড়িয়ে দেনা সব! পটাপট ভাঙ। আগুন জ্বালিয়ে দে।···চিনু, হোয়ার ইজ মাই টিপ? ইয়েস, ঠিক।···পান্না বোস হিজড়ে। সব শালা হিজড়ে।···হ্যাঁ—এখান থেকে ওখানটায়—ওই, ওই যে পাজামা পাঞ্জাবীপরা শুওরের বাচ্চা!···

মঘা একটু ঝুঁকে ডাকল, মাণিক, অ মাণিক! শুনছ? ওগো?

সমু গোঙাতে থাকল। তারপর ফের প্রলাপ।···বলছি না, এক্ষুনি আসব! বিশ্বাস হচ্ছে না? ঠিক আছে। একঘণ্টা পরে। হয়তো দুঘণ্টা। তিন·· চার···পাঁচ···ফিরতে নাও পারি। তুমি কাঁদবে না মা। তুমি বুড়ো হয়ে গেছ। কাঁদলে বিচ্ছিরি দেখাবে। চিনু, লাল ফুল ফুটেছেরে!···বিদ্যাসাগর···বর্ণবোধ·· হিঃ হিঃ হিঃ! দত্তর ক্লাসে আজ রুনু তাক লাগিয়ে দিয়েছে চিনু! ভীষণ পড়ে ও। ওর হবে। আমার কিস্যু হবে না। সুশি, এটা নেবে? হ্যাঁ—গাঁয়ের দিকে গিয়েছিলুম। শেকড় নয়—লতা। মনে হচ্ছে না, হারকিউলিস বসে আছে, কাঁধে পৃথিবী?···সুশিকে আমি চুমু খাব। ওকে আমি ভালবাসি। ওর মধ্যে ন্যাকামি নেই। ও একটু বোকা। তা হোক। বোকা মেয়েদের সঙ্গে সেক্স রিলেসন থাকা ভালো।···সুশি, সুশি! সুশি এসেছে?···

উঠে বসতে চেষ্টা করল সমু। মঘা তাড়াতাড়ি ওকে ধরে ফেলল।···ছোটবাবু, ছোটবাবু! শোও। কেউ আসেনি গো, কেউ আসেনি!

সমু লাল চোখে ওর দিকে তাকিয়ে থাকল কয়েকমুহূর্ত। যেন চিনবার চেষ্টা করছিল সে। তারপর বিড়বিড় করে বলল, তুমি কে?

আমি মঘা—মঘা।

আমার পায়ে কী চাপান আছে?

কিচ্ছু না গো—সেই জখম! পায়ে গুলি লেগেছিল না?

সমুর দৃষ্টিটা করুণ দেখাল।—জখম? কিসের? কেন?

সেই যে ইষ্টিশেনে মালগাড়ি ভাঙতে গিয়েছিলে, সোনা!—মঘা হাসবার চেষ্টা করল।

শাট আপ! আমি ভদ্রলোকের ছেলে। কলেজে পড়েছি। আমি কি ওয়াগনব্রেকার?

ওই হল বাপু। চুপ করো দিকি।

সমু একটু চুপকরে থেকে শান্তস্বরে বলল, ওটা আমার খেলা। আমি সত্যিসত্যি ওয়াগনব্রেকার নই।

সে তো বটেই। ···মঘা ওকে আশ্বস্ত করল।

আমি···সত্যি বলছি, বিশ্বাস করো—আমি···

বিশ্বাস করলুম রে বাবা। চুপ করো তো! জল খাবে? দোব?

সমু মাথা নাড়ল।

মঘা আস্তে আস্তে ঘটি থেকে জল ঢেলে দিল ওর মুখে। সমু জল খাওয়ার পর ডাকল, মঘাদা!

বলো মাণিক।

এখন দিন, না রাত?

ঘুরঘুট্টি রাত।

আকাশে তারা ফুটে আছে?

আছে বই কি।

মঘাদা, আমাকে বাইরে নিয়ে যাবে একবার?

উঁহু হুঁ···

তোমার পায়ে পড়ি মঘাদা।

মল ছাই! কী দেখবে গো এখন?

মঘাদা, তুমি একবার বাইরে গিয়ে ছাখো তো—কোথাও একটা তারা আছে নাকি—যার রঙ সবুজ—ভীষণ সবুজ!

যাঃ! ছেলেটা ক্ষেপা। তারা নাকি সবুজ হয়?

হয়, হয়। আমি দেখেছি।

হুঁঃ!

বিশ্বাস হচ্ছে না? তবে শোন। খুব ছেলেবেলায়—আমাদের একতালার ছাদে দাঁড়িয়ে আছি। ঠিক সন্ধেয়। হঠাৎ দেখি, উত্তরে একটা অদ্ভুত তারা জ্বলজ্বল করছে। দারুণ সবুজ। কতক্ষণ দেখতে থাকলুম। মনে হল, সবুজ তারাটা আমার দিকে এগিয়ে আসছে। ক্রমশ এগিয়ে আসছে। আমি ভীষণ ভয় পেয়ে পালিয়ে এলুম। মাকে বললুম। মা বলল, পাগল! হয়তো প্লেনটেন দেখেছিস!···কিন্তু মঘাদা, আমার স্পষ্ট মনে পড়ছে—ওটা প্লেন ছিলনা। ওটা একটা সত্যিকার সবুজ তারা।

হবে!···মঘা একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলল।

তারপর মাঝেমাঝে সেই সবুজ তারাটা আমি স্বপ্নে দেখেছি। জানো?

সত্যি নাকি?

হুঁ। আজও দেখলুম। এইমাত্র। স্বপ্ন দেখলুম, সে উঠেছে। তারপর—তারপর কী যে হল, বুঝতেই পারলুম না—আমি তার দিকে যাচ্ছি, না সে আমার দিকে আসছে।···

মঘা যেন একটা গূহ্যতত্ব টের পাচ্ছে। এভাবে রহস্যময় মৃদু হেসে মাথা দোলাল এবং বলল, তাপরে?

···তারপর···মনে হল, তারাটার ভিতর সবকিছু স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। সবুজ ঘাস গাছপালা সবুজ ছেলেমেয়ে।···কখন দেখি আমি তার মধ্যে—কখন দেখি, সবুজ তারাটা আমার মধ্যে···মঘাদা, জল খাবো।

ফের জল খেয়ে সমু বলল, ওরা কেউ আসেনি?

মঘা মাথা নাড়ল। তারপর হঠাৎ বলে উঠল—ওই যে সবুজ তারাটার কথা বললে—ওটার কথা ভুলে যাও ছোটবাবু।

কেন?

মঘা মুখ নামিয়ে ঘড়ঘড় করে বলল, ওটা তোমার মউতের নিশান ছোটবাবু!

মঘা, তুমি কাঁদছ?

মঘা মুখ নীচু করে বসে রইল।

আমি মরে যাব?···সমু ছটফট করে উঠল।···না। না না না।—সে দুহাতে মুখ ঢেকে দুপাশে মাথাটা দোলাতে থাকল।··· আমি মরব না। আমাকে বাঁচতেই হবে। না না না।

বাইরে থেকে ভীতু চাপা গলায় কে ডাকছিল, মগরেব, মগরেব আলি?···মেয়েলী কণ্ঠস্বর।

মঘা নড়ে উঠল।···কে, কে?

দরজাটা খুলে দিয়েই সসম্ভ্রমে সরে এল সে।···অ ছোটবাবু, তোমার কপাল গো। কেঁদোনা। অই ছাখো, নাজুর মা এয়েছেন তোমাকে দেখতে।

সুলতানা বেগমের সারা গায়ে চাদর জড়ানো—মাথা অব্দি। ঘোমটার ফাঁকে শুধু চোখ দুটো এবং অসম্ভব ফরসা নাকটা দেখা যাচ্ছিল।···ও কেমন আছে মগরেব?···সুলতানা দাঁড়িয়ে থাকলেন। সমু স্থির দৃষ্টে তাকিয়ে আছে।

মঘা বলল, থাকার কথা শুধোচ্ছেন বিবিজি? মউতের দরজায় চলে গেছে।

সুলতানা চাপা ধমকের সুরে বললেন, বালাই ষাট। হ্যাঁ গো ছেলে। চিকিৎসার ব্যবস্থা তো আজও হল না—না কী?

সমু হাসবার চেষ্টা করল।···আপনি নাজমার মা? আমাকে দেখতে এসেছেন? হুঁ—দেখে যান। উপদেশও দিয়ে যান—ভালো হও, সৎ হও। কেমন?

সুলতানার মুখটা দেখা যাচ্ছিল না। বললেন, সে পরের কথা বাবা। আগে সেরে উঠুন। তা মগরেব, চৌধুরীসায়েবকে ধরুক না ফারু—চাপ দিয়ে বলুক, একটা ব্যবস্থা করতে। আমার তো মুখ বন্ধ এসব ব্যাপারে। আর নাজমাও এদিকে বাপের মতে মত দিতে পিছপা নয়। সে নিয়ে মেয়ের সঙ্গে সন্ধে থেকে আমার কম হল না। আমি বলি—মানুষের জানটা আগে, তারপর তার ভালমন্দ দোষগুণ বিচার। তাই না? তার ওপর, ভদ্রলোকের

ছেলে—লেখাপড়াও জানে। মন ঠিক করতে তার কি বেশি সময় লাগে? মগরেব আলি না শুধরাতে পারে, এ ছেলের শুধরে নিতে দোষ কী?

সমু ডাকল, মা!

বলুন বাবা।

একটু বসবেন আমার কাছে?

সুলতানা নিঃশব্দে বসলেন মাথার পাশে।

মা! আমার কপালে একবার হাত রাখবেন?

সুলতানার মায়ের হাতটা—নরম ঠাণ্ডা সেই হাত—ধীরে—অতি ধীরে একটি উষ্ণ আর ক্ষুধার্ত কপালে নেমে এল। সমু চোখ বুজল।

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল শক্তিব্রতর। কী যেন শুনতে পেয়েছিলেন—একটা চাপা চিৎকার সম্ভবত। উঠে বসলেন তক্ষুণি। টর্চ জ্বাললেন। আরে! মনো কোথায় গেল? তিনি ডাকলেন, মনো! অ মনো!

কোন সাড়া পেলেন না। তখন খাট থেকে নেমে সুইচ টিপে দিলেন। আলোয় ঘর ভরে গেল। দরজাটা ছিটকিনি খোলা—কিন্তু কপাট দুটো বন্ধ। মনো কি বাথরুমে গেছে?

বাথরুমে যেতে হলে পাশের ঘরটার ভিতর দিয়ে যেতে হয়। শক্তিব্রত দরজা ঠেলে উঁকি মারলেন। রেখা একা ও ঘরে শুয়ে ছিল।

চমকে উঠলেন শক্তিব্রত। রেখা খাটের পায়া ধরে বসে আছে। মুখটা বিছানার প্রান্তে রাখা। পিঠটা ফুলেফুলে উঠছে। একটা হাত ফ্রকের ভিতর সম্ভবত পেটের নিচে—অন্যটা খাটের পায়ায়। তিনি দৌড়ে কাছে গেলেন।···কী রে রেখা? কী হয়েছে?

রেখা উঠে দাঁড়াল। ক্ষিপ্রহাতে প্যান্টের দড়িটা ঠিক করে নিল। তারপর কেঁদে উঠল সশব্দে।

নির্বোধের মত শক্তিব্রত বললেন, কী হয়েছে বলবি তো খুলে?

পরক্ষণে মেঝেয় মনোর রেলকোটটা পড়ে থাকতে দেখলেন। বাঘের মত গর্জে উঠলেন শক্তিব্রত।···মনো! ওরে শালা! বাষ্টার্ড! কুত্তার বাচ্চা!

তারপর দৌড়ে বেরিয়ে গেলেন। ষ্টেশনের কাছে এসে দেখলেন—কিংবা মনে হল, প্লাটফরমের শেষপ্রান্তে পিপুলগাছের নিচে মনমোহন দাঁড়িয়ে আছে। পাগলের মত দৌড়তে থাকলেন শক্তিব্রত।

তাঁর মনে হল, মননোহন রেললাইনের ধারে ধারে দৌড়চ্ছে। পাথর কুচি কুড়িয়ে ছুঁড়তে ছুঁড়তে শক্তিব্রত দৌড়চ্ছিলেন। পিছনে কারা চেঁচাচ্ছিল—বড়বাবু, বড়বাবু! কী হয়েছেটা কী—বড়বাবু! অনেকগুলো পায়ের শব্দ হচ্ছিল পিছনে। পাহারারত পুলিশ-গুলোও ছুটে আসছিল। শক্তিব্রত পিছন ফিরলেন না। পাগলের মতো দোড়চ্ছিলেন আর গাল দিচ্ছিলেন।···খানকির ব্যাটাকে আজ খুন করব। ওরে শালা, ওরে কুকুর···

ফার্ষ্ট সিগনালের কাছে এসে ফের মনে হল, আবছা আলোয় মনমোহনকে ছুটে যেতে দেখছেন। ফের দম নিয়ে দৌড়লেন শক্তিব্রত। ডিসট্যান্ট সিগনালের কাছাকাছি যেতেই পিছন থেকে কে তাঁকে ধরে ফেলল। ধ্বস্তাধ্বস্তি সুরু হল।···ছাড়ো, ছাড়ো আমাকে। আজ শালাকে খুন না করে জল গ্রহণ করব না।

কাকে খুন করবেন বড়বাবু?···নতুন ষ্টেশন-ইন-চার্জ কমবয়সী শিবশঙ্কর ভদ্র তাঁকে দুহাতে জড়িয়ে ধরল।···অসুস্থ মানুষ! এভাবে ছুটেছেন কোথায়?

ওই তো ডাকাতটা যাচ্ছে! আমাকে ছেড়ে দাও—ওই, ওই পালাচ্ছে···

কই কে?

কানা হয়েছ? দেখতে পাচ্ছো না? ওই তো! ওকে ধরো, ধরো!

বড়বাবু, আপনার হ্যালুসিনেসন! স্বপ্ন দেখে ছুটে এসেছেন।

পিছনে আরও কে বলল, সে তো হবেই। এত সৎ খাঁটি মানুষ! এতটুকু দুর্নীতি সইতে পারেন না কোনদিন। আমরা দেখে আসছি না? জনসাধারণের সম্পত্তিতে এভাবে ডাকাতি চলবে—আর সে কি না নিজের লোক—এ্যাঁ? ওকে কি কম স্নেহ করতেন শক্তিদা? সব সময় ওকে ছাড়া চলত না ওঁর।

কে বলল, সে তো বটেই। তবে ভগবানের মার মানুষের হাত দিয়েই তো পড়ে। পড়লও। বউটা বিধবা হল এই যা!

শক্তিব্রত ফ্যালফ্যাল করে তাকালেন।···কার বউ? কে বিধবা হল?

কেন? নিরঞ্জনের।

এ্যাঁ!

হ্যাঁ—এই তো খানিক আগে খবর পাওয়া গেল। বউর সঙ্গে কোথায় যাচ্ছিল না আসছিল সন্ধ্যা বেলা। রিকসোয় চেপে আসছিল। বাজারে ঢোকার আগে বাঁকটা আছে না? ডানদিকে ইটখোলা···বাঁয়ে পুকুর। ওখানেই কারা ষ্ট্যাব করেছে নিরঞ্জনকে। ওর বউশুদ্ধ জখম হয়েছে—তবে সামান্য। স্বামীকে বাঁচাতে গিয়েছিল। নিরঞ্জন সঙ্গে সঙ্গে শেষ।

শক্তিব্রত আস্তে আস্তে বসে পড়লেন। ওরা চেঁচাচ্ছিল—ওরে, বড়বাবু ফিট হয়ে গেছেন। খাটিয়াটা নিয়ে আয়। রামশরণ! ফজলু! শিবশঙ্কর বলল, আমার ক্যাম্পখাটটা আনুক বরং।

টেট্টি আমবাগানের কাছে হাইওয়েতে ট্রাকটা বাঁধল। বলল, জলদি ঘুমকে আনা।

তিনজন নামল গাড়ি থেকে। ফারুক, মিসটার আর চিনু।

টেট্টি সিগ্রেট ধরিয়ে হাসল একটু।···পহেলা কাম ঔর ইয়ে দুসরা কামকা ফারাক বহুৎ বড়া। ক্যা শোচা ভাইলোক?

মিস্টার বলল, কেন টেট্টিদা?

চিনুবাবুকে পহেলা পুছো। দুসরা পুছো, ফারুককো।

কী ব্যাপার রে চিনু?

চিনু বলল, ছাড়। আয়।

টেট্টি বলল, আরে—সমবাবু তুমহারা দোস্ত্ হ্যায় কী নেহী? তব্? হাঃ হাঃ হাঃ।

মিসটার বলল, ও। তাই বলো। তো টেট্টিদা, কভি কভি দোস্ত ভি দুষমন বন্ যাতা!

ওরা নয়ানজুলি পেরিয়ে রেল লাইনে পৌঁছল। সোজা হাঁটতে থাকল। তারপর লাইন ডিঙিয়ে মাঠে নামল। জঙ্গলের উত্তর প্রান্ত ঘুরে ফের উত্তরে বাঁক নিলেই সামনে গ্রাম।

শূন্য আখের ক্ষেত পেরিয়ে যেতে যেতে চিনু বলল, কিসের গন্ধ রে?

ফারুক বলল, গন্ধ? কই?

মিস্টার আর চিনু দুজনেই শুঁকছিল নাক উঁচু করে। মিস্টার বলল, হুঁ। গন্ধ। গন্ধটা কেমন যেন।

ফারুক টের পেল এতক্ষণে।···ও। কুকুরশুঁকোর ফুল ফুটেছে। এই যে এগুলো।·· বলে সে হেঁট হয়ে অন্ধকারে পটাপট্ কী ছিঁড়ল। এগিয়ে দিল চিনুর দিকে।

চিনু ফেলে দিয়ে বলল, ছ্যাঃ। কী বিচ্ছিরি গন্ধ রে! অথচ দূর থেকে বেশ লাগে।

মিস্টার বলল, চাঁদ উঠবে না?

তোর মাথা। চাঁদফাঁদ কোথায় পাবি আর?···ফারুক সকৌতুকে হাসল।···অ্যামেরিকানরা নিয়ে পালিয়ে এসেছে।

মিস্টার হেসে বলল, না রে। চাঁদে গিয়েছিল—গিয়ে হেগে

পচিয়ে দিয়েছে। এবার চাঁদ উঠলে ওয়ার্লডটা দুর্গন্ধে ভরে যাবে। কী বলিস চিনু ?

চিনু শুধু বলল, উঁ ?

মিস্টার ওর কাঁধে থাপ্পড় মেয়ে বলল, হল কী তোর ? কেমন যেন ভুজুং মেরে গেলি ! ফারু, তোদের গাঁয়ে লদকানো যায় না ? হাড়ি মুচি ডোম বাউরী—তাই সই। টবকা গোছের একটা চিপস্—শালা কুট্টুস মেরে পড়ে থাকবে !

ফারুক বলল, চিনু সত্যি ভুজুং মেরেছে রে। তবে হাতখানা মাইরি দেখবার মতো। ইটখোলার কাছে রিকসোটা যেই ঘুরেছে, কী কায়দায় ঝাড়লে দেখলি ? এক্কেবারে তিন ইঞ্চি না হয়ে যায় না। ফ্যাচ করে আওয়াজ হল। আমার তো তখন হাসি পাচ্ছে ব্যাপার দেখে। মাগীটা মিস্টারের পেটের তলে পড়েছে—কুমড়োদাবা যাকে বলে। হি হি হি ! তারপর···

এই ফারু !···মিস্টার লাফিয়ে উঠল।···চাঁদ উঠেছে মাইরি।

ফারুক আকাশ দেখতে থাকল।···কই রে ?

পিঠে ছোট কিল মারল মিস্টার।···শালা এখন নয়, তখন উঠেছিল। মাগীর সঙ্গে ফাইট দিতে দিতে ডাইনে ঘাড় ঘুরিয়েই হঠাৎ দেখি, উরে ব্বাস ! ছোটমামা এয়েছেন। ফারু, তোদের দেশের ভাষায় বললুম। শুনলি তো ? ছোটমামা এয়েছেন।

ছোটমামা ?

হ্যাঁ। চাঁদমামা—কিন্তু তখন ডুডুবাটু খাচ্ছেন কি না। তাই ছোটমামা।

ওরা দুজনে হাসল। তারপর ফারুক ডাকল, চিনু, থাম এখানে বসেই খোকাটা খালাস করা যাক্।···ব্যাগ থেকে একট বোতল বের করল সে।

চষা জমির চাঙড়গুলো নক্ষত্রের আলোয় ঝকঝকে সাদ দেখাচ্ছিল। তার ওপর দুজনে বসল। চিনু একটু পরে বসল

বোতল থেকে গলায় ঢালতে থাকল পালাক্রমে ফারুক আর মিসটার। চিনু বলল, নাঃ। বমি হয়ে যাবে এবার।

সিগ্রেট ধরাল ওরা—সাবধানে হাতের আড়ালে। চিনুও ধরাল। মিস্টার গুনগুন করে উঠল—মেরা সামনেবালা খিড়কি মে এক চাঁদকা টুকরা রহতী হ্যায়···

ফারুক বলল, চুপ। ওদিকে দেখছিস? বাঁশবনের ভিতর ওই আলোটা?

কিসের?

আখ মাড়াই হচ্ছে। গুড় জ্বাল দিচ্ছে। চোঁচাস নে।

হ্যাঁ রে ফারু, সেই খোঁড়া বদমাসটা আবার মস্করা করবেনা তো? ফান্টুসি করে ফেললে তো ঝামেলা। কী বলিস চিনু?

চিনু জবাব দিল না। ফারু বলল, নাঃ। মঘার এসব সইবে। তবে, শালাকে হটাতে হবে ওখান থেকে। আমি ডেকে আনব বাইরে বুঝলি? একটু তাফাতে নিয়ে যাব কোন কায়দায়। তোরা দুজনে ঢুকবি। চিনুটা ক্লান্ত মনে হচ্ছে। ও ধরবে—তুই···

চিনু বলল হঠাৎ, ফারু, পান্নাদার সঙ্গে টেট্টির কোথায় দেখা হয়েছিল?

টেট্টি তা বলবে নাকি? হারামীর বাচ্চাকে জবাই করলেও মুখ খুলবে না।

টেট্টিকে আমরা বিশ্বাস করছি কেন রে?

মিস্টার বলল, টেট্টি পান্নাদার এ্যাসিস্ট্যান্ট। পান্নাদা বলেনি?

চিনু চুপ করে থাকল।

ফারুক হাসতে হাসতে বলল, যদি কোনদিন পান্নালাল বোসের গলা কাটতে হয়—সে পবিত্র এবং মহান দায়িত্ব রইল আমার।

মিস্টার সপ্রশংস বলল, তুই বেশ বলতে পারিস তো? কদ্দুর পড়েছিলি?

ফারুক বলল, ও কথাটা এক নকসালের কাছে শুনে শিখেছিলুম।

মিস্টার ছেলেমি করে বলল, মাইরি—আমি আজ অব্দি নকসাল দেখিনি। নকসাল কেমন রে ফারু ?

চিনু আস্তে আস্তে বলল, সমুর কাছে দিব্যি করেছি—ওর বডিটা ওর মায়ের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। টেট্টিকে কথাটা বলতে ভুলে গেছি। ওর গাড়িটা যখন পাচ্ছি, তখন···

ফারুক হাসল।·· তাহলে সমুকে জ্যান্ত কলকাতা নিয়ে যেতেই আপত্তি কী ছিল বল্ ? পথে ছত্রিশবার গাড়ি সার্চ করেছে পুলিশ—না রে মিস্টার ?

মিস্টার বলল, হ্যাঁ।

যাবার সময়ও করবে। তখন ? আর—যা অবস্থা সমুর, গিয়েও কি বাঁচবে ? পা ঢোল হয়েছে ফুলে। গ্যাংগ্রিন হয়ে গেছে হয়তো। খামোকা ঝামেলা করে কী লাভ ?

চিনু ঝুঁকে এল।···তাহলে ও এমনি এমনি মরে যাক্। অপেক্ষা করি আমরা।

দেরী হতে পারে। ফারুক বলল।···আর অপেক্ষা করা যায় না। রোজ গাঁয়ে পুলিশ আসছে। কানাকানি হচ্ছে পাড়ায়। শুধু চৌধুরী বা আমার ভয়ে কেউ মুখ খুলতে সাহস পাচ্ছে না। ওকে জ্যান্ত ধরলে চৌধুরীও বিপদে পড়বে। বুঝছিস না ? আমার মাথার ওপর আস্ত বটগাছ সে।

মিস্টার বলল, তাছাড়া পান্নাদার অর্ডার। রিস্ক নিতে পারবি কেউ ?

চিনু জেদের সাথে বলল, পারতুম।

ও তোর মুখের কথা। ছেড়ে দে। পান্না বোস কী, তুই যেমন জানিস—আমিও জানি।

চিনু চুপ করে থাকল। ফারুক বলল, বেশি ভাবলেই জোর কমে যায়। ছেড়ে দে। চিনু, এ্যাদ্দিন কোন কাজে কোথাও কি আমরা ভেবেছি ? যা করতে হবে, সোজা করেছি। আজ ভাবব কেন ? সমু তোর যেমন বন্ধু—আমাদের সকলেরই বন্ধু। বন্ধুতাটা

হয় দুদিন আগে কারো, নয় পরে হয়েছে—এই তো? এই লাইনে এসব নতুন করছিস নে কেউ। এ শালা রিঙবাজী খেলা—যার যখন পালা পড়ে, মাথা গলাতেই হয়। আমরা তো খোকা নই—জেনেশুনেই এসেছি এ লাইনে। ওঠ্। দেরী হচ্ছে।

ওরা উঠে দাঁড়াল। চলতে থাকল। চলতে' চলতে ফের ফারুক বলল, আগে ওর বালিশের নিচে থেকে গানটা সরাবি—ভুলিসনে!

তারপর স্তব্ধতা। চৈত্রের মধ্যরাতে শূন্য আদিগন্ত মাঠের হাওয়া ঝাঁপিয়ে আসছে তিনটি দেহের ওপর। ওরা সামনে ঝুঁকে হাঁটছিল। আকাশে নক্ষত্র। মাথার ওপর হঠাৎ-হঠাৎ বুনো হাঁসের উড়ে চলার শন শন শব্দ। কোয়াক কোয়াক কোয়াক কোয়াক! হঠাৎ-হঠাৎ ডেকে উঠছিল পাখিগুলো। তারপর সামনে উঁচু ঝোপঝাড়ে ভরা জায়গা একটা—পুকুরের পাড়। ফারুক চাপা গলায় বলল, আমার পিছন-পিছন আয়।...আরে! কে কথা বলছে যেন। আলো! কী ব্যাপার?

তিনজনে চুপিচুপি ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। ভাঙাচোরা বাঁশের দরজার ফাটলে চোখ রাখল।

তিনজনেই দেখল, সমুর মাথার কাছে চাদরমুড়ি দেওয়া একজন স্ত্রীলোক বসে আছে। সমুর মাথায় হাত বোলাচ্ছে। সমু ডাকল, মা!

বলো বাবা।

আপনি আমাকে ফেলে যাবেন না।

কষ্ট একটু কমেছে?

মা, তারা কখনও সবুজ হয়? দেখেছেন?

সবুজ তারা? আসমানের? কই, দেখিনি তো বাবা।

আমি দেখেছি।

খোদার আসমানে থাকতে পারে বইকি। মানুষ কটুকুন জানে?

মঘাদা বলে আমি মরে যাব—তারই চিহ্ন ওটা।

বালাই ষাট। তুমি বাঁচবে। আবার ভালো হবে মানুষ হবে। দোওয়া করছি—তুমি কেঁদোনা—ছিঃ কাঁদতে নেই। আমি তো আছি! আমি তোমার মা। বুঝলে বাবা? আমাব কোন ছেলে নেই। তোমাকেই ছেলে বলে মানলুম। আহা, আমারটাও তো এমন হতে পারত গো। পারত না মগরেব ভাই?

হুঁ-উ। যে কালের হাওয়া বইছে—জানেন বিবিজি? হলেই হল। এ বাঞ্চোৎ সময়টাই এমন গো। সবার খুনের মধ্যিতে যেন শয়তান ড্যাং ড্যাং করে নাচছে। আই বাপ্, আমার বুকের ভেতর আজও তার নাচন থামল না বিবিজি! আমার বড় জ্বালা গো।...

দূরে সরে এসে চাপা হাসিতে ফেটে পড়ছিল ফারুক। কী কাণ্ড! চৌধুরী মাগকে পাঠিয়েছে নাকি রে? শালা কী ঝামেলা ছাখ তো। চল্, ওখানে একটু বসি। সারারাত তো থাকছে না মাগী।

ওরা সরে গিয়ে একটা ঝোপের ফাঁকে বসল। তাকিয়ে থাকল দরজাটার দিকে।

হাতেম চৌধুরী বাড়ি ফিরলেন এতক্ষণে। অন্যরাতের চেয়ে বেশ দেরীতেই। দেবীবাবু ফিরেছেন রাত আটটায়। তারপর দাবায় বসেছেন দুজনে। খেলা শেষ হতে বারোটা বেজে গেছে।

সিঁড়ি বেয়ে দোতালায় উঠেই দেখলেন, নাজমা আগের রাতের মত দাঁড়িয়ে রয়েছে। হাসতে হাসতে বললেন, কী রে মাদার ইণ্ডিয়া! ঘুমোসনি তোরা?

নাজমা গম্ভীর মুখে বলল, না।

হাতেম ঘরে ঢুকলেন। জামাকাপড় ছাড়তে ব্যস্ত হলেন। তারপর বললেন, খাওয়া হয়নি এখনও? কী যে করিস তোরা!

আমার জন্যে কেন অপেক্ষা করিস ? জানিসই তো—আমার দেরী হবে। ধেৎ !

নাজমা ঘরে ঢুকে বলল, কাকুর জীপটা আছে দেখলে ওখানে ?

হাতেম বিস্মিত হলেন।···জীপ ? কেন ?

বলছি। দেখলে, ওখানে আছে ?

কে জানে। তাকাইনি। কেন, বলবি তো ?

সুশি ঘুমিয়ে পড়েছে, না জেগে আছে ?

হ্যাঁ, জেগে আছে।···হাতেম অধৈর্য হয়ে বললেন।···আঃ, বল্ না কী ব্যাপার ?

সুশি জীপ পাঠাবে। সঙ্গে আসতেও পারে।

জীপ পাঠাবে ?

হ্যাঁ। সমুবাবুকে কলকাতা নিয়ে যাবার ব্যবস্থা হয়েছে।

হাতেম স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন কয়েক মুহূর্ত। তারপর চাপা গলায় বললেন, দেবী তো কিছু বলল না আমাকে। কে ব্যবস্থা করল ?

নাজমা হাসল।···আমি—মানে আমরা। সুশিদের পাড়ার ছেলে। ও সঙ্গে গেলে রিস্ক্ থাকবে না।

হাতেম রূঢ় ভাবে কী বলতে গিয়ে পারলেন না। চুপ করে থাকলেন। যাক্ গে, আপদ বিদায় হচ্ছে, সেই ভালো।

নাজমা বলল, তোমারও রিস্ক্ রইল না। কেমন ? খুসি হয়েছ তো ? লোকে জানলে আর ভোট দিত ভাবছ ? ছি ছি, চৌধুরী-সায়েব ওয়াগন ব্রেকারদের মুরুব্বী ! তাই না আব্বা ?

হাতেম হেসে উঠলেন।···ইংরেজী বলে ফেললেন খুসির তাগিদে।···আই একস্‌পেকটেড দ্যাট। তুই সারভাইভ করবি নাজু। এ পাজি যুগে মাথা ঠিক রেখে চলবার মত তাকৎ তোর আছে। ইউ আর ইনটেলিজেন্ট। কনগ্রাচুলেসন !

হাত নেড়ে দিলেন মেয়ের। নাজমা যেন বিদ্রূপ করে বলল,

মাথা বেঁচে গেলে সবাই কনগ্রাচুলেট করে! যাক্ গে, এখন আর'ও একটু বসো। মা নেই।

নেই মানে? সে আবার কোথায় গেল?

একটু আগে চুপিচুপি দেখে এলুম, ছেলের রোগশয্যায় পাশে বসে মাথায় হাত বুলোচ্ছেন। হাসতে হাসতে পালিয়ে এলুম। হিউম্যানিটির বান ডাকছে চৌধুরীফ্যামিলিতে। এর পর যদি পুলিশ বলে, পুরো ফ্যামিলিটাই ওয়াগনব্রেকিং আর রেলডাকাতির পিছনে আছে, ওদের দোষ দেব না।···নাজমা হেসে উঠল।

হাতেম কাঠ হয়ে শুনছিলেন। এবার সত্যিসত্যি বারান্দার ইজিচেয়ারটায় বসে পড়লেন। অস্ফুট কী বললেন—বোঝা গেল না।

নাজমা দূরের দিকে তাকিয়ে আছে। একটু পরে সে চাপা গলায় বলল, জীপটা আসছে। দেখে যাও আব্বা!

হাতেম ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে বললেন, তুই ছাখ। আর তোর মাকে শুদ্ধ চাপিয়ে নিয়ে যেতে বল্ কলকাতা। ওর তো এখনও গাল টিপলে দুধ বেরোয়। কী আক্কেল! এ্যাঁ?

নাজমা বলল, খবর্দার। তুমি মাকে কিচ্ছু বলবে না।

হাতেম চুপ করে গেলেন।

চাপা গুরগুর শব্দ শোনা যাচ্ছিল। আলো শিসিয়ে উঠছিল গাছপালার ফাঁকে। তারপর জীপটা সদর দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। নাজমা তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে বন্দুকটা নিয়ে এল। আব্বা, গোটা চারেক কারটিজ চাই।

ড্রয়ারে আছে—ওই টেবিলটা।···

কার্টিজগুলো দুটো বন্দুকে পুরে বাকি দুটো হাতে নিয়ে নাজমা দৌড়ে নেমে গেল নীচে। গেট খুলে দিয়েছে বাড়ির মাহিন্দার। নাজমা দৌড়ে গিয়ে ডাকল, সুশি, এসেছ?

সুশি নামল এবার। মুখটা গম্ভীর। শুধু বলল, গাড়ি এখানে থাকবে নাকি?

না। ওঠ। ওদিকে নিয়ে যেতে হবে। ড্রাইভার কে?

ভুজঙ্গদা।

তাড়াতাড়ি কিন্তু। এই, দুজন লোক নিয়ে এস তো রশিদভাই।

গাড়িটা বাড়ির পিছনে পোড়ো মাঠটায় গিয়ে দাঁড়াল। চারদিকে ঘন গাছপালা। আলো নিভলে ওরা নামল।

সুলতানা বলছিলেন, এবার উঠি বাবা। ওনার খেলেটেলে বাড়ি ফেরার সময় হল। না দেখলে চেঁচামেচি করবে। আর বলোনা গো, লোকটার ওই অভ্যেস! সময় ভাল নয়। চাদ্দিকে খুনখারাপি হচ্ছে। তার ওপর তুমি হলে এলাকার নামজাদা মানুষ—দুষমন তো কম নেই। তবু, বুঝলে বাবা? গ্রাহ্যি নেই একটুও। কী বর্ষা কী শীত—বারোমাস—বারোটামাস—বাবুর খামারে গিয়ে খেলা চাই-ই! এদিকে বুক দুদ্দুর করে রাত জাগছি আমি। বলো, ঘুম হয়—যতক্ষণ না ফেরে?

মঘা বলল, ওনার গায়ে হাত দ্যায় সাধ্যি কার? আমরা তো ডাকাতগুণ্ডা বটি—উনি আবার আমাদেরও ওস্তাদ! সেবারে দাঙ্গার সময়···

শুয়ে থাকো—কেমন? আল্লা মুসশিল আসান করবেন। ভেবো না।

সমু চোখ বুজে থাকল। মঘা ঝাঁপটা খুলে দিল।

সুলতানা বেরিয়ে গেলেন।

দ্রুত হাঁটছিলেন। তারপর থমকে দাঁড়ালেন। দুহাতে মুখ ঢাকলেন। টর্চের আলো পড়েছিল। বুক কেঁপে উঠল। শরীর ভারি হয়ে গেল। ছি, ছি, কী লজ্জাঘেন্নার কথা!

পরক্ষণে নাজমার কণ্ঠস্বর শুনে আশ্বস্ত হলেন সুলতানা। নাজমা এগিয়ে এসে বলল, শিগগির বাড়ি যাও। আব্বা এসেছেন।

এসেছেন ? আবার শিউরে উঠলেন সুলতানা।

তোমার ভয় নাই। আমি বলেছি। যাও।

তোরা কোথায় যাচ্ছিস ? ওরা কে ?

আঃ, সে খোঁজে দরকার কী তোমার ? ওকে নিতে এসেছে এরা। কলকাতা নিয়ে যাবে। হল তো ? যেন কোন জন্মের পেটের ছেলে! আদিখ্যেতা দেখে বাঁচা যায় না।

সুলতানা খুসি হয়ে হাঁটতে থাকলেন।

মঘাচাচা!

কে রে ? অ, ফারু!

তুমি একটু বাইরে এসো তো ?

কেন বাপ ? বেশ তো আরামে আছি। খোঁড়া মানুষকে আবার কষ্ট দেবে কেন ?

আহা, এসো না। কথা আছে।

উঁহু।

আসবে না ?

না।

মঘাচাচা!

বাপ ফারুক, বাঘের শিকারী আওয়াজটা আমি চিনিরে। ওই করেই বুড়ো হলুম। তফাৎ যা। ছোটবাবুকে শান্তিতে ঘুমোতে দে।

তাহলে যাব ভেতরে ?

মরদের বাচ্চা হলে আসবি বই কি। তৈয়ার আছে মঘা।

মঘা, মরবি ?

চলা আও!···বিরাট হেসোটা তুলে ধরল মঘা। দরজার দিকে সরে এল।

ফারু, চলে আয়। কারা আসছে।

ফারুক সরে আসতেই টর্চের আলো পড়ল তিনজনের ওপর। তিনটি হতভম্ব মূর্তি। কয়েকটি পলক মাত্র। তিনটি হাতে ছুরি ভোজালি পিস্তল।

এবং তিজনে লাফ দিয়ে ঝোপের ভিতর পড়ল। তারপর উধাও। নাজমা ঝোপের ওপর আলো ফেলতে থাকল কিছুক্ষণ ধরে। সুশি ডাকছিল, তাড়াতাড়ি!

মঘা হাউমাউ করে কেঁদে উঠেছে—আজ দিনমান কেউ যখন এল না, তখনই সন্দ হয়েছিল। ছোটবাবু বলেছিল কথাটা—ওরা এবার গলাটা কাটতেই আসবে!

নাজমা বলল, চুপ মঘাচাচা। চেঁচিও না। ওকে নিয়ে যাচ্ছি আমরা। রশিদ, এস।

মঘা ডাকছিল, ছোটবাবু, ছোটবাবু! ছাখো, ছাখো, কারা নিতে এয়েছে। চোখ খোল সোনা।

সমুর স্বপ্নটা ভেঙে গেল।···

কতক্ষণ পরে হাইওয়ের পথে ছুটে চলেছে জীপটা। পায়রাডাঙা এগ্রিকালচারাল ফার্মের দেবী ব্যানারজির জীপ। নাম শুনলেই তো সাতখুন মাপ। তারওপর স্বয়ং তাঁর মেয়ে রয়েছে। ফিরছে বাবার খামার থেকে।

পিছনের অন্ধকার ঘুপটিতে মেঝেয় শুয়ে আছে সমু। সামনের সীট থেকে মাঝে মাঝে উঁকি মেরেও ওকে দেখতে পাচ্ছিল না সুশ্বেতা। পিছনের অন্ধকারে অস্ফুট গোঙানি কখনও—কখনও কিছু অসংলগ্ন কথা শোনা যাচ্ছে।

সুশ্বেতা দাঁতে দাঁত চেপে বলল, আরো স্পীড দাও ভুজঙ্গদা! রাত শেষ হয়ে এল যে!

হ্যাঁ, রাত শেষ হয়ে আসছে। পূর্বদিগন্তে একটা উজ্জ্বল

নক্ষত্র নিষ্পলক তাকিয়ে আছে পৃথিবীর দিকে। সমু তাকালে দেখতে পেত, দেখে বলে উঠত—ওই তো সেই!

কলকাতা পৌঁছতে ভোর হয়ে যাবে।

আর ওখানে দূর পাড়াগাঁয়ের একটি কুঁড়েঘরে ততক্ষণে এক-চোখো একঠেঙে কুচ্ছিতচেহারার লোকটা চরম প্রশান্তিতে ঘুমোতে গিয়ে, ঘুমের মধ্যে হয়তো বা কোন সবুজ নক্ষত্রের খোঁজে ছোটাছুটি করে, হঠাৎ একবার চমকে উঠেই চুপ করে গেল। তার মনে হল, বুকের ওপর গুরুভার চাপ নিয়ে এতদিনে মৃত্যুদূত আজরাইল এসে বসেছে। আর সেই আজরাইলের চোখেই সবুজ নক্ষত্রটার লাল হয়ে যাওয়া দেখতে দেখতে সে এগিয়ে গেল এবং এগিয়ে গেল—যেখান থেকে আর ফেরা যায় না।

বাইরে থেকে ফারুক রুদ্ধশ্বাসে বলল, শ্বাসনলীটা কেটে দে মিষ্টার! এখনও গেঙাচ্ছে যে!

খোদাতালার দুনিয়ায় তখন গভীর প্রশান্তি। পাখিরা ডেকে ওঠার জন্যে উন্মুখ। বসন্তকালের সব লালফুল রঙের উজ্জলতা নিয়ে আত্মপ্রকাশের প্রতীক্ষায় নিশ্চুপ। সব কালো জল তাদের হৃদয়ের গভীরতা নিয়ে উদ্‌গ্রীব। এর নাম ব্রাহ্ম মুহূর্ত। এখনই অনির্বচনীয় সত্যের স্বরূপ 'সোবেহ্ সাদেকে'র উদয়ক্ষণ।

তিনজন পাপী মানুষ খুব ভয়ে ভয়ে পায়রাডাঙার ধুসর মাঠ পেরিয়ে পালিয়ে গেল।...